মুনতাসীর মামুন

কার্টুনে মুক্তিযুদ্ধ

আজ থেকে প্রায় দু'যুগ আগে মুক্তিযুদ্ধের উপাদান বা দলিলপত্র সংরক্ষণের জন্য একটি প্রচেষ্টা গ্রহণ করি। এর কারণ ছিল একাধিক। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তখন গবেষণা যে হচ্ছিল না তা নয়, কিন্তু সেখানে লক্ষ্যণীয় ছিল পুনরাবৃত্তি। এর কারণ ছিল তথ্যের অভাব। অন্যদিকে, ক্ষমতায় আসীন তখন বিএনপি-জামায়াত। তারা মুক্তিযুদ্ধের দলিল বিকৃত করছে। জামায়াতপন্থীরা বিভিন্ন গ্রন্থাগারে গিয়ে ১৯৭১ সালের সংবাদপত্র বিনষ্ট করছে। প্রমাণ করার চেষ্টা করছে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের ভূমিকাই প্রধান। আমি তখন জেল থেকে বেরিয়েছি। মনে হলো, ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে এ ধরণের অপচেষ্টা রোধ করা দরকার। সে পরিপ্রেক্ষিতে গঠন করি গবেষণা কেন্দ্র 'বাংলাদেশ চর্চা'। এখান থেকে প্রকাশ শুরু করি *গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ* বা *Media and Liberation War* গ্রন্থমালা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধই সারা বিশ্বের মানুষ—কে নাড়া দিয়েছিল প্রবলভাবে। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রে [বিশেষ করে ভারতে] মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস বিভিন্ন খবর ছেপেছে। এসব বিবরণ তখন ছিল আমাদের অজানা। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রকল্প ছিল, প্রতিবছর এসব সংবাদপত্রের বিভিন্ন খবরাখবর আমরা গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করব। এতে দেখান যাবে, সংবাদে জিয়াউর রহমানের কোনো উল্লেখ নেই, আছে শুধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা। অন্যদিকে, মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রও সংরক্ষিত হবে। আজ ২০ বছরে আমরা ২৮ খণ্ড প্রকাশ করেছি। এবং এতে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যারা গবেষণা করছেন তারা খানিকটা হলেও উপকৃত হয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই।

ঐ গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ড ছিল কার্টুন বিষয়ক। মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশ-বিদেশের সংবাদপত্রে বিভিন্ন কার্টুন বেরিয়েছিল। সেগুলির সংকলন। তরুণ রিয়াজ আহমদ দু'বছর পরিশ্রম করে প্রায় ৩৫০টি কার্টুন সংগ্রহ করেছিলেন।

তারই সংকলন ছিল প্রথম খণ্ড।

বছর ছয়েক আগে আমরা খুলনায় প্রতিষ্ঠা করেছি '১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর'। বছর চারেক আগে জাদুঘরে স্থাপন করা হয়েছে 'গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র'। এই কেন্দ্র থেকে গত চার বছরে আমরা ১৫০টি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করেছি যা মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা শুধু সমৃদ্ধ নয় অনেক ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের আর্কাইভে কয়েক লক্ষ পাতার নথিপত্র আছে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা, প্রতিবেদন, ভিডিও, আলোকচিত্র, শিল্পীদের ছবির প্রতিকৃতি, কার্টুন—এসব কিছুই ইলেকট্রনিক আর্কাইভে সংরক্ষিত আছে।

দু'দশক পর আমরা মুক্তিযুদ্ধ গবেষণায় বৈচিত্র আনতে চাচ্ছি। মুক্তিযুদ্ধ একরৈখিক নয়, বহুমাত্রিক। প্রথম দিকে গুরুত্ব পেয়েছে যুদ্ধ বা বিজয়ের ইতিহাস। গত প্রায় এক দশক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে গণহত্যার ওপর। কিন্তু, বিষয় আছে আরো, যেমন— আঞ্চলিক বাহিনী, শত্রুপক্ষ, বিশ্ব সিভিল সমাজ। এমনি নানা বিষয়। এসব বিষয় নিয়ে গবেষণা করলে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপকতা বোঝা যাবে, বৈচিত্র্যময় হবে গবেষণা। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আবার উদ্যোগ গ্রহণ করি কার্টুনের একটি সংকলন প্রকাশ করার। দু'দশক আগে প্রকাশিত, রিয়াজ আহমদের *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* প্রথম খণ্ড তো ছিলই, এছাড়া, আমাদের আর্কাইভসে রক্ষিত পত্র-পত্রিকা থেকেও প্রায় নতুন ১৫০টি কার্টুন সংযোজিত হলো। দু'দশক আগে মওদুদ ইলাহী সংকলিত *Assignment: Bangladesh'71*-এ প্রথম বিদেশি পত্র-পত্রিকায় সংকলিত কিছু কার্টুন প্রকাশিত হয়েছিল যা সংকলিত হয়েছিল রিয়াজের গ্রন্থে। আমরা ঐ দুটি গ্রন্থ এবং নতুনভাবে সংগৃহীত কার্টুনগুলি সংরক্ষণ করেছি। এবং এসব কার্টুন সংকলন করতে গিয়ে দেখেছি রিয়াজের গ্রন্থে বেশ কিছু ভুল আছে। সে সব ভুল সংশোধন করে আমরা আর্কাইভে সংগৃহীত সব কার্টুন বিন্যস্ত করেছি। এ প্রবন্ধের ভিত্তি সংগৃহীত সব কার্টুন।

২

প্রায় তিনযুগ আগে খবু সম্ভব লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে গেছি। এক জায়গায় দেখি লেখা র‍্যাফায়েলের কার্টন। র‍্যাফায়েলের অনেক ছবি দেখেছি কিন্তু কার্টন তো দেখিনি। কিন্তু দেখলাম কার্টন হিসেবে যা প্রদর্শিত হচ্ছে তা বড় আকারের ক্যানভাসে র‍্যাফায়েলের ড্রইং। কার্টুন বললে আমরা এখন বিশেষ এক শিল্পকর্ম বুঝি। আসলে মূল ছবির আগে যে খসড়া করতেন শিল্পী তাই পরিচিত ছিল কার্টন হিসেবে। সেই কার্টন [বা লে

আউট] থেকে কার্টুন শব্দের উৎপত্তি, কিন্তু কার্টুন এখন আর খসড়া নয়। একবারই আঁকা এবং সেটাই 'ফাইনাল'।

ব্যঙ্গচিত্র বা কার্টুন ও ক্যারিকেচার অঙ্কনশিল্পের একটি শক্তিশালী মাধ্যম; বর্তমানে মতামত প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমও বটে। কার্টুন মূলত একটি সম্পূর্ণ আকারের স্কেচ বা অঙ্কন যা একটি ট্যাপেস্ট্রি, পেইন্টিং, মোজাইক বা অন্যান্য গ্রাফিক আর্ট ফর্মের প্যাটার্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১৮৪০ এর দশক থেকে ক্যারিকেচার, বিদ্রুপ এবং সাধারণত কৌতুকরসবোধ ব্যবহার করে এটি চিত্রাঙ্কিত প্যারোডি আকারে হাজির হয়। বর্তমান আধুনিক সময়ে কার্টুনের প্রধান ও প্রাথমিক কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজনৈতিক ভাষ্য এবং সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় মতামত প্রচার, এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক কমেডি উপস্থাপন। ক্যারিকেচার ও কার্টুনের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। ক্যারিকেচার হচ্ছে ব্যক্তি, প্রকার বা কাজের একধরণের বিকৃত উপস্থাপনা। সাধারণত কোনো একটা বিষয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যকে অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয়, বা মানুষের দেহাঙ্গকে প্রাণী, পাখি বা সবজির বিভিন্ন আকৃতি দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়, এবং প্রাণীদের বিভিন্ন কার্যকলাপের অনুরূপ কোনো একটা ক্রিয়াকে উপস্থাপন করা হয়। যেমন, কোনো একটি নেতিবাচক চরিত্রের (মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে ধরা যেতে পারে ইয়াহিয়া খান) সাথে কুমির বা হিংস্র কোনো প্রাণীর কার্যকলাপের সাদৃশ্য দেখানো যেতে পারে। ক্যারিকেচার যেখানে ব্যক্তিকে [ইন্ডিভিজুয়াল] নিয়ে কাজ করে, সেখানে কার্টুন দল [গ্রুপ] বা যৌথ বৈশিষ্ট্যকে নিয়ে কাজ করে। যদিও সাধারণ পাঠক বা দর্শকের কাছে কার্টুন ও ক্যারিকেচারের এই সূক্ষ্ম পার্থক্য বজায় থাকে না, সবকিছুই 'কার্টুন' নামে চিহ্নিত হয়; বাংলায় একে বলা হয় 'ব্যঙ্গচিত্র'। এই লেখাতেও কার্টুন ও ক্যারিকেচার দুটোকেই আসলে 'কার্টুন' শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়েছে।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যঙ্গ হিসেবে কার্টুনের জন্ম আসলে ইউরোপের রেনেসাঁর কালেই। রেনেসাঁর মাধ্যমে ইউরোপে যে নতুন ব্যবস্থা, সৌন্দর্যবোধ, মূল্যবোধ জন্ম নিয়েছিল কার্টুন ছিল অংশত এর একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ। এর দৃশ্যমান সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যটিকে বলা যেতে পারে যে এটি পুরানো লোকজগুলির গভীরতা থেকে, রেনেসাঁর অভিনবত্ব, নতুন ব্যবস্থা এবং হায়ারার্কির প্রতি একধরণের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। *এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায়* কার্টুনের ইতিহাস সম্পর্কে লেখা হয়েছে, আধুনিক অর্থে কার্টুন কেবল তৎকালীন শৈল্পিক প্রবণতারই প্রতিক্রিয়াতে সৃষ্টি হয় নি, বরঞ্চ যে প্রবণতাগুলো আধুনিক রাষ্ট্র, এর সমাজ, এর বিজ্ঞান এবং

ধর্মকে তৈরি করেছে সেগুলোর প্রতিক্রিয়াও বটে। রাজনৈতিক স্যাটায়ার হিসেবে কার্টুনের ইতিহাস *ব্রিটানিকা* আঠারো শতক থেকে শুরু করেছে। এটি সম্পাদকীয় মতামত, সামাজিক পরিবর্তন ও গতিপ্রকৃতির যেন একটি চুম্বকঅংশ। বর্তমানে, এবং [আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে] এটাই কার্টুনের মূলধারা।

রাজনৈতিক কার্টুন রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যকার সংলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ সার্বজনীন হাতিয়ার, এবং রাজনৈতিক ঘটনার সামাজিক প্রতিক্রিয়া বা প্রতিবিম্ব। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো একটি রাজনৈতিক ঘটনা বা কোনো একজন বিশেষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কর্মকাণ্ডকে বিদ্রুপাত্মক বা হাস্যরসাত্মকভাবে সমালোচনা করা। রাজনৈতিক কার্টুন সরকার ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন নীতিকে নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং জনপ্রিয় সংস্কৃতির অসঙ্গতিকে ফুটিয়ে তোলে। সাংবাদিকরা যে সংবাদ প্রকাশ করেন, সেটা অঙ্কনরীতি মেনে কার্টুনিস্টরা পাঠক ও দর্শকের সামনে আরো শক্তিশালীভাবে [বিদ্রুপাত্মকভাবে বা হাস্যরসাত্মকভাবে] হাজির করেন। জনমত গঠন ও জনসম্মতি আদায়েও বর্তমানে রাজনৈতিক কার্টুন ভূমিকা পালন করে। কেউ কেউ কার্টুনকে 'educator and editorialist, seller and seducer' হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন। ফলে, সাধারণত কার্টুনকে যেভাবে কেবল 'হাস্যরসাত্মক' বা 'কৌতুকময়' বিষয় বলে চিহ্নিত করা হয়, সেটা পরিবর্তিত হয়ে কার্টুন একটি গুরুতর চেহারা বা রূপ ধারণ করেছে। কার্টুনকে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশে বা সরকারকে বা আধিপত্য বিস্তারকারী ডিসকোর্সকে চ্যালেঞ্জ করতেই যে কেবল ব্যাবহার করা হয়েছে তাও না। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসীবাদী পত্রিকা, ট্যাবলয়েড, ম্যাগাজিন নিয়মিত ইহুদি-বিদ্বেষী কার্টুন প্রকাশ ও প্রচার করতো। এমনকি, হেটস্পিচ বা ঘৃণ্যকথন, বা বিদ্বেষ ছড়ানোর কাজেও কার্টুনকে ব্যবহারের বহু নজির পৃথিবীতে রয়েছে।

তবে একেবারে সাম্প্রতিক সময়ে, বলা যায় এই একবিংশ শতকে, রাজনৈতিক কার্টুনকে ঘিরে যে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে তা বোধহয় ইতিহাসের আর কখনোই ঘটেনি। একদিকে রাষ্ট্রগুলো, তা গণতন্ত্রী হোক বা স্বৈরতন্ত্রী হোক বা ফ্যাসিবাদী হোক, মতের বিরোধী কার্টুনিস্টদের উপর দমন পীড়ন করছে। অন্যদিকে, ২০০5 সালে ডেনমার্কের একটি পত্রিকা নবী মোহাম্মদের (দ:) কার্টুন ছাপানোতে প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি হয়। মুসলমান দুনিয়া প্রচণ্ড ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ২০১৫ সালে ফরাসি পত্রিকা *শার্লি হেব্দো* একইরকম ধর্মীয় বিতর্কের বেড়াজালে পড়ে। নবী মোহাম্মদের (দ:) কার্টুন

ছাপানোর প্রতিক্রিয়ায় ইসলামি সন্ত্রাসীদের হাতে *শার্লি হেব্দোতে* ১৭ জন প্রাণ হারান। সারা দুনিয়াতে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানানো হয়, আক্রান্ত কার্টুনিস্টদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করা হয়। একই সাথে আবার রাজনৈতিক কার্টুনকে কেন্দ্র করে বাকস্বাধীনতার সীমানা নিয়েও প্রাচ্যে ও পশ্চিমে জোরেশোরে বির্তক শুরু হয়। কেউ কেউ তা বাকস্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখেছেন, আবার কেউ কেউ এতে আক্রমণাত্মক বিদ্রুপ দেখেছেন। কার্টুনকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া এমন বিতর্ক এখনো চলছে।

আমরা যে কার্টুনগুলো সংগ্রহ করেছি সেগুলো একাত্তর সালে এই ভূখণ্ডে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে অঙ্কিত। কোনো সন্দেহ নেই, মুক্তিযুদ্ধের মতো একটি প্রবল রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আঁকা কার্টুনগুলোকে 'রাজনৈতিক কার্টুন' বর্গেই ফেলা হয়েছে। রাজনৈতিক কার্টুন পাঠ করার জন্য কার্টুনে উপস্থাপিত বিষয়, কার্টুনিস্ট, এর দর্শক ও পাঠক, এবং যে সামাজিক ও ঐতিহাসিক ঘটনার ভেতর এই কার্টুন আঁকা হয়েছে সেটা সম্পর্কে সম্যক বোঝাপড়া প্রয়োজন। কার্টুনের ভাষা বোঝার জন্য কখনো কখনো কার্টুনিস্ট প্রদত্ত বাক্য, সংবাদ ইত্যাদি সহায়ক। তবে কোনো কোনো তাত্ত্বিক বলেন, সকল কার্টুনের জন্য কার্টুনিস্ট প্রদত্ত তথ্যের প্রয়োজন পড়ে না, কার্টুন নিজেই নিজের কথা বলতে পারে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্টুন মূলত আঁকা হয় কোনো একটা নির্দিষ্ট সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ও একটি নির্দিষ্ট বাস্তবতায়। সেই নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করে কার্টুনের মর্মোদ্ধার করা বা পাঠ করা অসম্ভবই বটে। তবে, কার্টুন আসলে কোনো ঘটনাকে তুলে ধরে না, বরঞ্চ ঘটনা সম্পর্কিত একটি 'ন্যারেটিভ' বা 'বয়ান' বা একটি 'দৃষ্টিভঙ্গি' ফুটিয়ে তুলে। একাত্তরে প্রকাশিত কার্টুন নিয়ে আলোচনাতেও আমাদের এটা বিবেচনায় রাখা উচিত যে, এই কার্টুনগুলো আমাদের সামনে মূলত একটি 'ন্যারেটিভ' বা 'বয়ান' হাজির করবে।

৩

বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশে কার্টুনের প্রচলন আসলে সংবাদমাধ্যম শুরু হওয়ার সাথে জড়িত; ফলে ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ার সাথেও জড়িত, এবং আরো বহু জিনিসের মতন ঔপনিবেশিক শাসকদের কল্যাণে আমদানিকৃত। ১৫৫০ সালে পর্তুগিজদের কল্যাণে এই উপমহাদেশে মুদ্রণযন্ত্র এলেও প্রথম পত্রিকা প্রকাশিত হয় ব্রিটিশদের হাত ধরেই। কোম্পানির ধারণা জেমস অগাস্টাস হিকি ১৭৮০ সালে *বেঙ্গল গেজেট* প্রকাশিত করেন, কিন্তু ইস্ট

ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ সংবাদ পরিবেশনের জন্য দুই বছরের মাথায় সেই মুদ্রণযন্ত্র জব্দ করা হয়। কিন্তু এর মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই আরো বহু সংবাদমাধ্যমের জন্ম হতে থাকে। ১৮৭৯ সালে বাঙালি-মালিকানায় প্রকাশিত হয় *দা বেঙ্গলি*, ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত হয় *অমৃতবাজার পত্রিকা*। প্রথমে বাংলায় প্রকাশিত হলেও পরবর্তীতে সেটা দ্বিভাষী হিসেবে চালু থাকে।

কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র উপনিবেশ স্থাপনকারীদের হাত ধরে প্রবেশ করলেও বাংলার সমাজ জীবনে রঙ্গব্যঙ্গ বা রসাত্মকভাবে উপস্থাপনের বিভিন্ন মাধ্যমের কমতি ছিল না। লোকগানে, গম্ভীরা, গাজন, ছড়ায়, পুতুল নির্মাণে, সমসাময়িক বিষয় ও প্রচলিত প্রথা-রীতি-নীতির প্রতি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠতো। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সেন 'মস্করী' নামক একটি শব্দের বিষয়ে বলতে গিয়ে লেখেন, "আমরা বুদ্ধের সময় হইতে একদল লোকের সাক্ষাৎ পাই যাহাদের ব্যবসা ছিল ছবি দেখাইয়া লোকের মধ্যে শিক্ষা প্রচার করা। ইহাদিগের উপাধি ছিল "মস্করী"।" এছাড়াও বাংলা লিখিত গদ্যে ব্যঙ্গকৌতুক এবং সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি তুলে ধরার প্রচলন ছিল বহু আগ থেকেই। *নববাবু বিলাস*, *হুতুম প্যাচার নকশা* এই ঘরনার সৃষ্টি। এর ধারাবাহিকতা উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতাকেন্দ্রিক ক্যারিকেচার ব্যাপারটা চালু হয়।

ভারত উপমহাদেশে প্রথম মুদ্রিত কার্টুন *Delhi Sketch Book*, সেটা ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের আগের ঘটনা। এরপর ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয় *Indian Punch*। কলকাতায় সেই বছরেই প্রকাশিত হয় *Indian Charivari*। কার্টুনের জন্য প্রসিদ্ধ দৈনিক *অমৃতবাজার পত্রিকা* প্রথম কার্টুন ছাপায় ১৮৭২ সালে। বাংলা ভাষার প্রথম কার্টুন পত্রিকা *হরবোলা ভাঁড়* প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সালে; প্রাণনাথ দত্ত *বসন্তক* নামের পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৮৭৪ সালে। ইংরেজি কমিক ম্যাগাজিন *Punch* এর আদলেই এখানকার ম্যাগাজিনগুলো কার্টুন ছাপানো শুরু করে, তা সে ম্যাগাজিন ইংরেজ মালিকানা বা ভারতীয় মালিকানা যাই হোক না কেন। ব্রিটিশ মালিকানাধীন কমিক ম্যাগাজিনগুলো খোদ লন্ডনের মতো করে বয়ান বা রূপ তৈরি করতো। লন্ডনে প্রকাশিত কার্টুনগুলোতে চিরাচরিত ঔপনিবেশিক উপস্থাপনাই থাকতো। যেমন, এখানে উপনিবেশের মিশন হচ্ছে 'সভ্যতা বানানোর মিশন,' বা 'হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন'। কার্টুনে বাঙ্গালিদেরকে অজ্ঞ হিসেবে বিদ্রুপাত্মকভাবে তুলে ধরতো। বাঙালি কার্টুনিস্টরা তাদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ফলে ব্রিটিশ-প্রভু ভক্তি থেকেই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান

জীবনযাপন নিয়ে বিদ্রুপ না করে বরঞ্চ নিজেদের সমাজেরই স্যাটায়ার করতেন। কার্টুনের মাধ্যমে উপনিবেশ শাসকদের আক্রমণ না করে বরঞ্চ ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিদের ভণ্ডামি উন্মোচনের দিকেই বেশি নজর দেয়া হতো। ঔপনিবেশিক সেন্সরশীপও এর একটা কারণ হতে পারে।

বসন্তক বাংলা ভাষার দ্বিতীয় কার্টুন পত্রিকা; এই অঞ্চলে কার্টুন চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ। ইংরেজ শাসনের প্রতি কোনোরকমের ভণিতা না করে হাসি-ঠাট্টার ছলে তীব্র সমালোচনা করার সাহস দেখিয়েছিল *বসন্তক*। তবে বিষয়বস্তু নির্বাচন বা মানসিকতার দিক থেকে *বসন্তক* সবসময় যে প্রাগ্রসরতার পরিচয় দিতে পেরেছিল, তাও নয়। বরঞ্চ, নারীশিক্ষার প্রশ্নে, ব্যক্তিগত আক্রমণ, জাতিগত আক্রমণও এর বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল। এসব এই কার্টুনের মানকে কখনো কখনো নিম্নগামী করেছিল বলেও গবেষকরা মত দেন। তবে গবেষকরা বলেন যে, ঔপনিবেশিক আমলে প্রকাশিত কার্টুনগুলো যতটা না রাজনৈতিক কার্টুন তার চাইতে বেশি সামাজিক কার্টুন।

কলিযুগের ব্রাহ্মণ, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই অঞ্চলের প্রথমদিককার কার্টুনিস্টদের মধ্যে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশরঞ্জন দাস, চারু রায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায় এবং প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাম। গগনেন্দ্রনাথের কার্টুনে বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অসঙ্গতিগুলো ফুটে উঠেছিল। অন্যদিকে প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী, কার্টুনিস্ট দুনিয়ায় যিনি

পিসিএল নামে পরিচিত, দেশভাগের আগে ও পরে দুই বাংলাসহ পুরো ভারতজুড়ে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেন। ভারতের কার্টুনিস্ট আবু আব্রাহাম, কুট্টি, শংকর, লক্ষণ এরা প্রচণ্ড জনপ্রিয় কার্টুনিস্টদের কাতারে নাম লেখান। ষাটের দশকে এই অঞ্চলের কার্টুনিস্টরা যখন রাজনৈতিক কার্টুন আঁকছেন তখন তাঁদের উপর বিশেষভাবে এদের প্রভাব ছিল। ভারতের জাতীয় আন্দোলন তথা স্বাধীনতা আন্দোলনে কার্টুনের অবদানের কথা অনেকেই বলেছেন।

দো পেয়াজার আঁকা 'হরফ খেদাও', *সৈনিক*

দেশভাগের পর ঢাকাকেন্দ্রিক শিল্পচর্চা শুরু হলেও বাংলাদেশের কার্টুনিস্টরা ধীরে ধীরে নিজেদের মেলে ধরতে থাকেন। পঞ্চাশের দশক থেকেই এখানে ব্যাপকভাবে কার্টুনচর্চা শুরু হয়। জয়নুল আবেদিন, কাজী আবুল কাশেম, কামরুল হাসান ওরফে 'ভিমরুল', রফিকুন নবী ওরফে 'রণবী', জামির, মীজান, কালাম মাহমুদ, আজিজুর রহমান, মোস্তফা মনোয়ার, হাশেম খান, সিরাজুল হক সারদা, শাহতাব, সালেহ চৌধুরীসহ আরো বহু গুণিজন এই চর্চায় যোগ দেন। বিশেষত রণবী পরবর্তীতে বাংলার কার্টুন জগতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেন। গত শতকের পঞ্চাশ দশকে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেও বেশ কিছু কার্টুন ছাপা হয়েছিল। *সৈনিক* প্রকাশ করে কাজী আবুল কাসেমের 'হরফ খেদাও আন্দোলন' শীর্ষক কার্টুন। ষাটের দশকে যখন স্বাধীকার আন্দোলন, এবং পরবর্তীতে স্বাধীনতা আন্দোলন তুঙ্গে উঠছে, তখন কার্টুনিস্টরাও সক্রিয়ভাবে তাতে অংশগ্রহণ করেন। তবে, যেহেতু পুরো পাকিস্তান আমলজুড়ে সামরিক শাসন রাজনৈতিক অঙ্গনে গণতান্ত্রিক সমালোচনার পরিবেশ অনুপস্থিত ছিল, সেহেতু সেখানে সরাসরি রাজনৈতিক কার্টুন আঁকা সহজবোধ্য ছিল না। ষাটের দশক

থেকে গণসচেতনা বৃদ্ধিতেও বিভিন্ন কার্টুন প্রকাশিত হতে শুরু হয়।

কার্টুনের ইতিহাস বর্ণনা এখানে মূল উদ্দেশ্য নয়। উনিশ শতক থেকেই বাংলায় কার্টুন আঁকার শুরু। গত শতকের চল্লিশ দশকে আমাদের দেশের শিল্পীরা দু'একটি কার্টুন আঁকা শুরু করেন। এঁদের মধ্যে আবুল কাশেম ও কামরুল হাসান পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। কামরুল আঁকতেন 'ভীমরুল' নামে আর কাশেম 'দোপেয়াজা' নামে। স্বাধীনতার পর অনেকেই এঁকেছেন, যেমন, রফিকুন নবী বা রণবী, নজরুল, কুদ্দুস, শিশির, শাহরিয়ার, আহসান হাবিব প্রমুখ। এঁদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য মণ্ডিত রণবী। তাঁর আঁকা *টোকাই* সিরিজ বাংলাদেশে তাঁর পরিচিতি বিস্তৃত ও সুদৃঢ় করেছে। সুতরাং, কার্টুন আঁকা ও দেখার ঐতিহ্য আমাদের আছে। তবে, ইদানীং খবরের কাগজ বা সংবাদপত্রে কার্টুন আর তেমন দেখা যায় না বিশেষ করে রাজনৈতিক কার্টুন। তার কারণ রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা। কোন দেশে গণতান্ত্রিক বোধ প্রবল তা বোঝার মাপকাঠি হতে পারে কার্টুন। যে দেশে রাজনীতিবিদরা রাজনৈতিক কার্টুন সহ্য করতে পারেন সে দেশ গণতন্ত্র সহিষ্ণু বলে বিবেচিত হতে পারে।

৪

আমার আলোচনা ১৯৭১ সালে দেশ-বিদেশে প্রকাশিত কার্টুন নিয়ে। ১৯৬৯-৭০ সালের বিষয় নিয়েও কিছু কার্টুন সংকলিত হয়েছে বিশেষ করে আহমদের। কারণ, তাঁর ২০টি কার্টুন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক পটভূমি তুলে ধরে। এ কার্টুনগুলি রিয়াজ আহমদ প্রথম সংগ্রহ করেন।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কার্টুন বেশি প্রকাশিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্র পত্রিকায়। কলকাতা থেকে প্রকাশিত *দৈনিক যুগান্তর* ও দিল্লি থেকে প্রকাশিত *টাইমস অব ইন্ডিয়াতেই* বেশি কার্টুন প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া *দৈনিক আনন্দবাজার*, *কালান্তর*, *সাপ্তাহিক দেশ*, *দর্পণ*; ইংরেজি *অমৃত বাজার পত্রিকা*, *স্টেটসম্যান*, *হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড* নিয়মিত কার্টুন ছেপেছে। কোনো কোনো পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় একটি স্পেস বরাদ্দ থাকত ছোট কার্টুন বা 'পকেট কার্টুনের' জন্য। সেগুলোর মূল শিরোনাম ছিল 'অব্যর্থ', 'থার্ড আই ভিউ', 'স্মাইল এ ডে' প্রভৃতি। এসব কার্টুন যারা এঁকেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, অমল, চণ্ডী, সুফি, কুট্টি, লক্ষণ, রেবতীভূষণ, আবু, সুধীর দার প্রমুখ। এদের অনেকের কার্টুন দেশের একাধিক পত্রিকায় ও বিদেশেও ছাপা হতো বিশেষ করে আবুর। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সবচেয়ে বেশি এঁকেছেন অমল চক্রবর্তী [অমল] ও আবু আব্রাহাম। আবুর বাংলাদেশ সংক্রান্ত কার্টুন নিয়ে একটি অ্যালবাম প্রকাশিত

হয়েছে যা আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি।

মুক্তিযুদ্ধের সময় *বাংলার বাণী*, *পিপল* প্রকাশিত হয়েছে মুজিবনগর থেকে। সেখানে বাঙালি কার্টুনিস্ট নয়ান, সাতুন এঁকেছেন যাঁদের আসল পরিচয় উদ্ধার করতে পারিনি। ১৯৭০ সালে *ফোরাম* পত্রিকায় রফিকুন নবী নিয়মিত এঁকেছেন। তাঁর প্রচ্ছদচিত্র ছিল কার্টুন। সেগুলি এখানে সংকলিত হয়েছে। মোহাম্মদ ইউনুস আমেরিকা থেকে *বাংলাদেশ নিউজলেটার* বের করতেন। সেখানে তিনি নিজেই কিছু কার্টুন এঁকেছেন। সেগুলিও সংকলিত হলো, উল্লেখ্য, ভারতে যাঁরা এঁকেছেন তাঁদের অধিকাংশের সঙ্গে 'আর্ট স্কুল' বা 'কলেজের' কোনো যোগাযোগ ছিল না। বাংলাদেশে যাঁরা এঁকেছেন তাঁদের অধিকাংশের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল আর্ট 'স্কুল' বা 'কলেজের'।

পাশ্চাত্যের পত্র-পত্রিকায়ও ছাপা হয়েছে কার্টুন তবে সংখ্যায় কম। ভবিষ্যতে খোজাঁখুজি করলে হয়ত আরো অনেক কার্টুন পাওয়া যাবে।

'আমি মনে করতে পারছি না, কতদিন ধরে বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা করছি'

১৫ এপ্রিল ১৯৭১, *দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*/ আবু আব্রাহাম

কার্টুন নানা বিষয়ে হতে পারে, তবে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কার্টুন সাধারণত: আঁকা হয় রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে। ফিগার বা মুখের বিকৃতায়নই কার্টুন নয়। কার্টুনের একটা বিষয় থাকতে হয়, ভাবনা থাকতে হয়। বিভিন্ন শিল্পীর রেখার ব্যবহারের কারণে শিল্পীর বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়। আবু ও চণ্ডীর রেখা এক নয়। কার্টুন যিনি আঁকেন তাঁকে তো অবশ্যই রাজনীতি সচেতন

হতে হয়। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে জানা থাকলে কার্টুন ভিন্ন মাত্রা পায়, যেমন আবু আব্রাহম। এ ছাড়া, রাজনৈতিক বা যে কোনো ধরণের মতাদর্শ থাকাটাও জরুরি।

কার্টুনের শিল্পীরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন তো বটেই, মানবতাবাদীও বটে। আব্রাহামের একটা কার্টুন আছে এক ভিয়েতনামি ও বাঙালি কৃষক-কে নিয়ে। তিনি যখন লন্ডনে ছিলেন তখন *গার্ডিয়ানে* কাজ করেছেন যা ছিল মৃদু বাঁ ধারার পত্রিকা। ভিয়েতনামে মার্কিন হামলা তাঁর পছন্দের ছিল না। তাই তিনি পেরেছেন দুই কৃষককে এক করে কার্টুন আঁকতে যা ভিন্ন মাত্রা প্রদান করেছে কার্টুনটিকে। তাঁদের আঁকা কার্টুনগুলির বিষয় ছিল শরণার্থী, গণহত্যা, প্রশাসন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ইতিহাস ইত্যাদি। মুখ্য চরিত্র হিসেবে আছেন ভারতের ইন্দিরা গান্ধী, পাকিস্তানের ইয়াহিয়া-ভূট্টো, মাঝে মাঝে শেখ মুজিব। পাশ্চাত্যে এসেছেন নিক্সন-কিসিঞ্জার বা অন্য কেউ। কিছু কিছু ক্ষেত্র ছাড়া সবাই ইয়াহিয়া-কে দানব, হিংস্রপশু, হিটলার হিসেবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এক্ষেত্রে কামরুল হাসানের ইয়াহিয়াকে নিয়ে আঁকা 'আসুন আমরা পশু হত্যা করি'— বলা যেতে পারে ১৯৭১ সালে আঁকা সবচেয়ে জোরালো কার্টুন [অনেকে এতে অবশ্য আপত্তি করতে পারেন]। পোস্টার হিসেবেও সেরা। অনেক কার্টুনে ক্যাপশন নেই। শিরোনামেও। বিষয়বস্তু দেখেই সবাই আঁচ করতে পারেন বক্তব্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূট্টো-কে খলনায়ক বা ভিলেন বা সামরিক বাহিনীর আজ্ঞাবহ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এ কার্টুনগুলি ছাপা হয়েছে ৫০ বছর আগে। আমরা এগুলি সংগ্রহ করেছি বিভিন্ন বই, ইন্টারনেট ও আমাদের আর্কাইভস থেকে। কপিরাইটের বিষয়টি কোথাও উল্লেখ করা হয়নি।

৫

বাংলা পত্র-পত্রিকায় বেশি ছাপা হয়েছে অমল চক্রবর্তী, নরেন রায়, চণ্ডী লাহিড়ী, কুট্টি আর রেবতীভূষণের কার্টুন। তাঁদের ছাড়া যে অন্যদের কার্টুন নেই তা নয়, আছে, তবে তাদের কার্টুনের সংখ্যাই বেশি।

পশ্চিমবঙ্গে যারা কার্টুন এঁকেছেন সত্তর দশকে, তাদের মধ্যে অমল চক্রবর্তী [জ. ১৯৩৬] অন্যতম। তিনি প্রধানতঃ *যুগান্তরের* জন্য কার্টুন এঁকেছেন। তবে, কিছু কার্টুন প্রকাশিত হয়েছিল *স্টেটসম্যান*, *টাইমস অব ইন্ডিয়া*, *অমৃত বাজার পত্রিকা* [ইংরেজি] ও *হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড*—এ। কিছু কার্টুন বাংলা কার্টুনের প্রতিরূপ এবং সেটি স্বাভাবিক। এখানে তাঁর কয়েকটি

কার্টুনের উল্লেখ করছি। তিনি কার্টুনে স্বাক্ষর করতেন 'অমল' নামে।

৩ মার্চ *যুগান্তরে* অমলের প্রথম কার্টুনটি ছাপা হয়। বঙ্গবন্ধু মুজিব জিতেছেন কিন্তু, পাকিস্তানিরা নানা কূটকৌশল করছেন বিশেষ করে ইয়াহিয়া ও ভূট্টো। তারা কিছুতেই মুজিবকে ক্ষমতায় যেতে দেবেন না। ৩ মার্চ পরিষদ বসার কথা কিন্তু ভূট্টো বলেছেন পরিষদ বসলে রক্তগঙ্গা বইবে। ইয়াহিয়া ভূট্টোর প্ররোচনায় স্থগিত করলেন পরিষদ অধিবেশন। সেই সংকটময় মুহূর্ত অমল তুলে ধরেছেন চমৎকারভাবে। মুজিব নায়ক, খুব বিচলিত নন। ১ তারিখ ভূট্টো ইয়াহিয়া যৌথভাবে অ্যাকশন শুরু করেছেন, এতে তিনি খানিকটা চিন্তিত।

৩ মার্চের কার্টুনটিও বেশ। আলোচনা চলছে দু'পক্ষে। দীর্ঘদেহী মুজিব দাঁড়িয়ে, তাঁর দাঁড়াবার ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে তাঁর দাবিতে তিনি অনড়। সেনাবাহিনীর প্রতীক ইয়াহিয়া, সেটাই হুমকি। ভূট্টোর আশঙ্কা মুজিব না সমঝোতা করে বসেন। সে জন্য ভূট্টো শাসাচ্ছেন ইয়াহিয়াকে এই বলে যে, বেফাঁস কিছু বলবেন না।

যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে। ইয়াহিয়া সামরিক বাহিনীকে আঁকা হয়েছে প্রাগৈতেহাসিক ডাইনোসর হিসেবে। এক ধরণের ডাইনোসর ছিল যার শরীরের তুলনায় মাথা খুবই ছোট। দেখা যাচ্ছে, মুক্তিফৌজ তার মাথায় উঠে গেছে হাতিয়ার নিয়ে [এক্ষেত্রে লাঠি] ৯ এপ্রিল কার্টুনটি ছাপা হয়েছিল *যুগান্তর*—এ।

দর্পণ—এ ছাপা হয়েছিল একই দিন ইয়াহিয়াকে নিয়ে আরও একটি কার্টুন। ইয়াহিয়া তান্ডব শুরু করেছেন বটে কিন্তু অন্তিমে তার পতন ঘটবে। সে জন্য গোরস্থানে একটি কবর রিজার্ভ করে রাখা হয়েছে তার জন্য। লেখা হয়েছে 'এই কবরটি ইয়াহিয়া খাঁর জন্য রিজার্ভ রহিল।'

চীন-পাকিস্তান-কে সমর্থন করছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে নকশালপন্থি আন্দোলন জোরদার হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধ তাদের পছন্দের নয়। তারা শ্লোগান দিয়েছে- চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। ইয়াহিয়াও শ্লোগান লিখছেন—চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। একই কার্টুনে দু'ধরণের ঘটনা নিয়ে আঁকা খুবই কষ্টকর। অমল সেটা পেরেছেন।

বৃটিশ পার্লামেন্টারী দল এসেছে পাকিস্তান। ইয়াহিয়া 'দুঃখিতভাবে' জানিয়েছেন, বাঙালিদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। কিন্তু এই স্বীকৃতি ছিল এক ধরণের কুম্ভীরাশ্রু। ১৬ জুন *যুগান্তরে* প্রকাশিত হয়েছিল কার্টুনটি।

১৯ জুন শরণার্থী সমস্যা কার্টুন [*যুগান্তর*] এর বিষয়বস্তু। ভারতের জন্য

এটি তখন বিরাট সমস্যা। শরণার্থী মানুষটিকে তাই আঁকা হয়েছে বড় করে। ভারত [বা পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং] বিশ্ব নেতাদের কাছে পরিস্থিতি তুলে ধরতে চাইছেন। তারা এতে আগ্রহী নন। শরণ সিংকে এড়িয়ে চলছেন।

৩ জুলাই *যুগান্তরের* কার্টুনের বিষয়বস্তু অস্ত্র প্রতিযোগিতা। পাকিস্তান গণহত্যা চালাচ্ছে। তার অস্ত্র দরকার। মাও ও নিক্সন তাকে অস্ত্র সরবরাহের জন্য দৌড় প্রতিযোগিতায় নেমেছেন।

রাজনীতি সচেতন না হলে কার্টুন আঁকা কষ্টকর। শুধু তাই না এক ধরণের পক্ষপাতও হয়ত কাজ করে তার মনে। আবু আব্রাহামের মতো অমলও রাজনীতি সচেতন। আবু আব্রাহামের মতো হয়ত এতো তীক্ষ্ণ নন। কিন্তু, আবার ভারতীয় বিষয়ে তাঁর রসবোধ তীক্ষ্ণ। তিনি নিজে বলেছেন, তিনি শৈল চক্রবর্তীর ড্রইং দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু আমার ব্যক্তিগতভাবে তা মনে হয়নি। তাঁর ড্রইং সবল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রেখার তীক্ষ্ণতা লক্ষ্যণীয়।

৩ জুলাই ১৯৭১, *যুগান্তর/ অমল*

চণ্ডী লাহিড়ীর জন্ম নবদ্বীপে ১৯৩১ সালে। ১৯৫০ সালে কলকাতায় আসেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম এ করেন। চণ্ডী লাহিড়ী তাঁর কার্টুনে শুধু চণ্ডী নামেই স্বাক্ষর করতেন। কলকাতায় ট্রাম দুর্ঘটনায় তিনি একটি হাত হারান। কিন্তু, এই বিপর্যয় তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। ১৯৫১ সালে দৈনিক *লোক সেবক*—এ যোগ দিয়ে তিনি তাঁর সাংবাদিক জীবন শুরু করেন।

আর্ট কলেজে শিক্ষা নেননি চণ্ডী। কিন্তু, তারপরও ১৯৬২ সাল থেকে কার্টুন আঁকা শুরু করেন। ঐ সময় তিনি যোগ দিয়েছিলেন *আনন্দবাজার* গ্রুপে। গ্রুপের অন্য দৈনিক *হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডেও* আঁকতেন। *আনন্দবাজারে* 'তির্যক' ও *স্ট্যান্ডার্ডে* 'থার্ড আই ভিউ' নামে প্রথম কলামে দুটি স্পেস থাকত কার্টুনের জন্য। অনেকে এ স্পেসে ছাপা কার্টুনকে 'পকেট কার্টুন'ও বলতেন। ৩০ বছর একটানা এই গ্রুপে তিনি কাজ করেন।

চণ্ডী নিজেকে শুধু কার্টুনের জগতেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। নানা জনহিতকর কাজের জন্য বিনামূল্যে ছবি/কার্টুন এঁকে দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে এনিমেশনের কাজ তিনিই শুরু করেছিলেন। লেখালেখি করেছেন ছোটদের জন্য। লিখেছেন, *বাংলা কার্টুনের ইতিহাস*। পরিণত বয়সে ২০১৮ সালে ৯৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

১৯৭১ সালে স্বাভাবিকভাবেই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তিনি এঁকেছেন। *আনন্দবাজারে* 'তির্যক'-এ, *দেশ*-এ পুরো পৃষ্ঠার বেশ কিছু কাঁটুন তিনি এঁকেছেন। ১০ এপ্রিল 'তির্যক'- এ ছাপা কার্টুনটির বিষয়বস্তু, সংকট ও কৌতূহল। বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন সংবাদ ছাপা হচ্ছে তখন পত্র-পত্রিকায়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষজন কৌতূহলী হয়ে উঠছেন। দল বেঁধে তারা সীমান্তে যাচ্ছেন, যেন এটি এক ধরণের মজা— পিকনিক। সীমান্তরক্ষী খুবই বিরক্ত এতে। বলছেন— 'কলকাতার কাছে অনেক পিকনিক করার জায়গা আছে, এখানে কেন?' পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিকে কষাঘাত করছেন চণ্ডী, গণহত্যা কি দেখার বিষয়— এটিই ছিল তার জিজ্ঞাসা। ছোট স্পেসে কী দারুণ ড্রইং-এ ফুটিয়ে তুলেছেন ব্যাপারটি। চণ্ডী সাধারণত মোটা তুলিতে আঁচড় কাটেন কিন্তু এখানে নিব ব্যবহার করেছেন।

'তির্যক'—এ ১২ এপ্রিল [খুব সম্ভব] আরেকটি কার্টুন ছাপা হয়েছে ইয়াহিয়াকে নিয়ে। ১১ এপ্রিল ছিল ইস্টার সানডে। ইয়াহিয়া কেনাকাটা করছেন। দু'হাত ভরে শপিং করেছেন, সেগুলি হলো মানুষের মাথার খুলি। কার্টুনের নিচে মন্তব্য 'ইস্টারের কেনাকাটা'। ছোট পরিসরে পাকিস্তানের নির্মমতা তুলে ধরেছেন কুশলি ড্রইংয়ে।

২০ এপ্রিল ১৯৭১। আনন্দবাজার পত্রিকা। চণ্ডী

২০ এপ্রিল 'তির্যক'-এ ছাপা হয়েছে ইয়াহিয়াকে নিয়ে। অহরহ মিথ্যা বলে চলেছেন ইয়াহিয়া পাকিস্তান বেতারে। তখন হোসেন আলী বাংলাদেশের পক্ষে এসেছেন, পাকিস্তান বেতার থেকে বলা হচ্ছে— 'ডাহা মিথ্যা। কলকাতায় আমাদের কোনো দূতাবাস ছিল না।' এরকম ডাহা মিথ্যা বলেছেন নিয়মিত, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ৫০ বছরের ব্যবধান। কিন্তু সময়, প্রযুক্তি বদলালেও স্বৈরাচারের প্রকৃতি বদলায় না।

ছোট পরিসরে কার্টুন আঁকায় দক্ষতা প্রয়োজন কারণ ঐ স্পেসে কয়েকটি চরিত্র আঁকা যায় না। একটি চরিত্রই আঁকতে হয়। চণ্ডী তা অনায়স দক্ষতায় পেরেছিলেন তাঁর সবল স্ট্রোক এর কারণে।

পুতুক্কোদি কোট্টুতোদি শঙ্করণ কুট্টি নায়ার—এ নামের ব্যক্তিটিকে অধিকাংশ পাঠকই চিনবেন না, এমনকী শঙ্করণ কুট্টি বললেও না। কিন্তু যদি শুধু বলা হয় কুট্টি তা হলে এক নামে সবাই তাকে চিনবেন। তবে সংক্ষেপে অনেকে তাঁকে বলেন পিকেএস কুট্টি। তাঁর জন্ম ১৯২১ সালে, কেরালায়। শিল্পকলায় অ্যাকাডেমিক শিক্ষা নেই। ১৯ বছর বয়সে মালায়লম পত্রিকায় কার্টুন আঁকেন। ১৯৪২ সালে যোগ দেন নেহেরুর পত্রিকা *ন্যাশনাল হেরাল্ড*-এ। কাগজ বন্ধ হয়ে গেলে মাদ্রাজ ও মুম্বাইয়ের পত্রিকায় বছর ছয়েক কাজ করার পর ১৯৫১ সালে যোগ দেন আনন্দবাজার গ্রুপে। এই গ্রুপের তিন পত্রিকায় *হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, আনন্দবাজার ও সাপ্তাহিক দেশ* পত্রিকায় দীর্ঘ ৩৫ বছর কার্টুন আঁকেন। ১৯৮৬ সালে যোগ দেন *আজকাল* পত্রিকায়। তারপর একেবারে অবসর নিয়ে বছর দশেক পর চলে যান আমেরিকায়। সেখানেই মারা যান ২০১১ সালে। কুট্টির ভাষা মালায়লম, শিষ্যও ছিলেন আরেক মালায়লম শঙ্করের। কিন্তু জীবনের প্রায় ৫০ বছর যুক্ত ছিলেন বাংলা পত্রিকার সঙ্গে। ইংরেজিতে কার্টুনের শিরোনাম বা ক্যাপশন লিখতেন। সেগুলি অনুবাদ করে নেয়া হতো। লেখালেখিও করেছেন। তাঁর আত্মজীবনীর নাম *ইয়ারস অব লাফটার: রেমিনিসেনসেস অব এ কার্টুনিস্ট*।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ঘটনাবলি নিয়ে কুট্টি অনবদ্য সব কার্টুন এঁকেছেন বিশেষ করে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়কে নিয়ে, যাকে তিনি আখ্যা দিয়েছিলেন 'বঙ্গেশ্বর ২' নামে। শঙ্কর অতুল্য ঘোষের নাম দিয়েছিলেন 'বঙ্গেশ্বর' সিদ্ধার্থ ও জ্যোতি বসুর যে মুখ তিনি এঁকেছেন সে রকম ক্যারিকেচার তাঁদের দুজনের আর কেউ করতে পারেন নি। কার্টুনের ইতিহাস লিখতে গিয়ে সুমিত ঘোষ তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন, "বাঙালির হৃদয়কে এক কাফী খাঁ ছাড়া তাঁর মতো আর কেউ নাড়া দিতে পারেন নি। আসলে, বাংলার রাজনীতির জটিল সমস্যায় তিনি অনায়াসে ঢুকতে পারতেন এবং রসায়ন ব্যঞ্জনাময় রূপক উপমা উৎপ্রেক্ষণ শ্লেষ সংলাপ টিপ্পনীর সাহায্যে মজাদার কৌতুক চিত্র তৈরি করতে পারতেন যাতে সাধারণ পাঠকের পক্ষে জিজ্ঞাস্য বিষয়টির অর্থভেদ করা সম্ভব হতো।"

সাপ্তাহিক *দেশ* পত্রিকায় ৬ মার্চ পুরো পৃষ্ঠাব্যাপী কুট্টির কার্টুন প্রকাশিত হয়, শিরোনাম- 'চ্যালেঞ্জ'।

বাংলাদেশে চলছে অসহযোগ আন্দোলন। মুজিবই এখানে সর্বেসর্বা।

মুজিব-কে দীর্ঘকায় সবল একজন ব্যক্তি হিসেবে আঁকা হয়েছে। ভূট্টো তাকে চ্যালেঞ্জ করছেন। কুট্টির আঁকা ভূট্টোর ক্যারিকেচার অন্যদের আঁকা ভূট্টো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভূট্টো-কে নিয়ে তিনি অনেক মশকরা করেছেন নয় মাস। এখানেও ভূট্টোকে আঁকা হয়েছে রুগ্ন, বলহীন এক বৃদ্ধ হিসেবে।

দেশ-এ ২২ মে আরেকটি কার্টুন দেখেছি কুট্টির। সমসাময়িকদের আঁকা অন্যান্যদের কার্টুন থেকে একেবারে ভিন্ন ধরণের। ভারত-কে আঁকা হয়েছে উট হিসেবে। তার পিঠে নানা সমস্যা— পশ্চিমবঙ্গ, বেকার, নকশাল ইত্যাদি। এরমধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা বাংলাদেশের শরণার্থী সমস্যা। সেটি যেন ভারসাম্য নষ্ট করে দিচ্ছে, ইন্দিরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন।

'একটু হাসুন স্যার' এই শিরোনামে ১১ সেপ্টেম্বর কার্টুন ছাপা হয়েছে *দেশ*—এ। সেই ভূট্টো ক্যামেরা হাতে। সামনে পর্বতসমান মাও সে তুং, পেছনে চু এন লাই। ক্যামেরাম্যান ভূট্টো বলছেন 'একটু হাসুন স্যার', আসলে তখন মাও/ চু বা ইয়াহিয়া কারো মুখে তেমন হাসি ছিল না। পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। পুরো সংকটময় আবহটা তুলে ধরাই ছিল কুট্টির উদ্দেশ্য।

আনন্দবাজারে ২৫ ডিসেম্বর ও ৩০ ডিসেম্বর দুটি কার্টুন ছাপা হয়েছে ইয়াহিয়া ও ভূট্টোকে নিয়ে। প্রথমটি একটি সার্কাসের জায়গা। ট্রপিজে খেলা দেখাচ্ছেন ইয়াহিয়া। একপাশে পাটাতনে নিক্সন ও মাও সে তুং—দুই মহাশক্তি। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। তারা এখন হাত ধুয়ে ফেলেছে। পতিত নায়কের প্রতি তাদের কোনো সমবেদনা নেই। ট্রপিজ থেকে ইয়াহিয়ার পা ফসকে গেছে। তিনি সাহায্য চাচ্ছেন নিক্সন ও মাও থেকে, তারা বলছেন 'ইয়াহিয়া, খুবই দুঃখিত।'

বাংলাদেশ স্বাধীন, ভারত পাকিস্তান যুদ্ধও শেষ। ভূট্টো ক্ষমতায় পশ্চিম পাকিস্তানে। তিনি তখনও চীন ও মার্কিন সাহায্যের আশাপ্রার্থী, ব্যায়ামাগারে দুর্বল ভূট্টো দুটো বাবরেল হাতে নিয়ে দুই মিত্রকে বোঝাতে চাচ্ছেন, তার শক্তি এখনও নি:শেষ হয়ে যায় নি।

মনোরমা পত্রিকায় কুট্টিকে নিয়ে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। সুমিত ঘোষ তা থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করেছিলেন- "বাঙালি তিন মালয়ানি শঙ্করকে মনে রেখেছেন হিন্দু বৈদান্তিক আদি শঙ্কর, রাজনৈতিক শঙ্করণ নাম্বুদিরিপাদ ও শঙ্করণ কুট্টি।"

রেবতীভূষণ ঘোষ [১৯২১-২০০৭] ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয় কার্টুনিস্ট। তাঁর সময়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব কাগজেই কার্টুন এঁকেছেন, লিটল ম্যাগাজিনেও। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর আঁকা কার্টুনগুলি

ছিল নির্মল হাসির খোরাক। তাঁর ড্রইং লেটারিং এমনকী নিজের নামের স্বাক্ষর সব স্বতন্ত্র, সৃষ্টি করেছেন তার নিজস্ব শৈলী ও অংকনরীতি। বোঝা যায় কার্টুনগুলি মাস্টার কার্টুনিস্ট—এর আঁকা। ক্যাপশন ছাড়াই যা উপভোগ করা যায়। স্বাভাবিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের সময়ই তিনি এঁকেছেন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি-কে সামনে রেখে। চীন-মার্কিন সম্পর্ক, বৃহৎ শক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গী, জাতিসংঘের নীরবতা এসবই বিষয় হয়ে এসেছে। তাঁর কার্টুনে যে সূক্ষ্ম রস তা অন্যান্য কার্টুনে অনুপস্থিত।

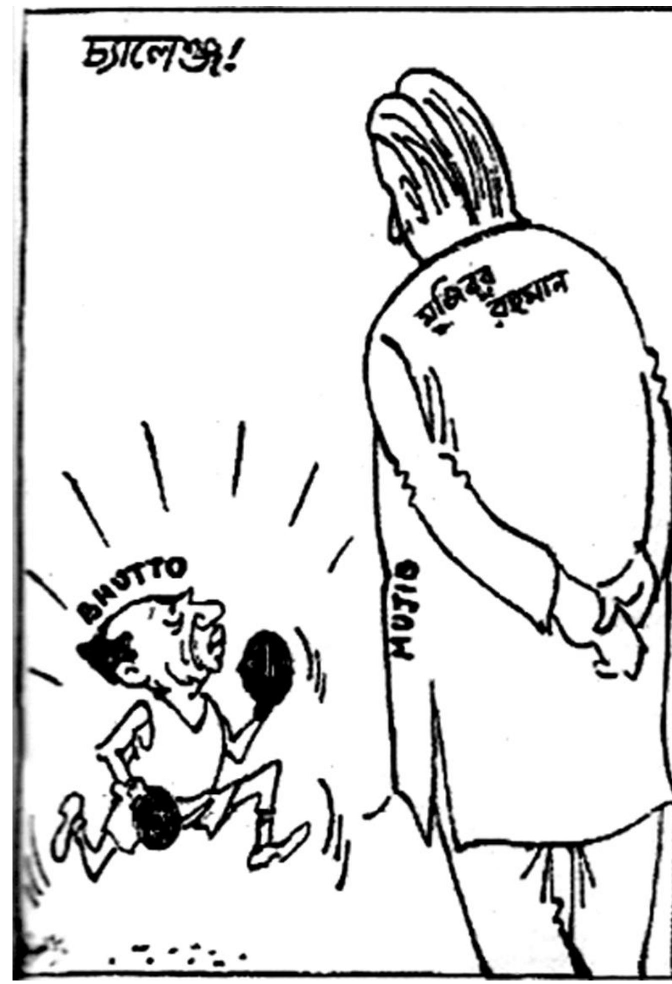

৬ মার্চ ১৯৭১, সাপ্তাহিক দেশ/ কুট্টি

১০ মার্চ ১৯৭১, যুগান্তর/ রেবতী ভূষণ

রেবতীভূষণের প্রথম কার্টুন পাই **১১** মার্চ *যুগান্তরে*। শিরোনাম— 'কাছির টান'। তিনজন কার্টুনের বিষয়বস্তু। মুজিব অনড় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। ইয়াহিয়া তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। ঢাকায় এসেছিলেনও। তারপর ভুট্টোর সঙ্গে লারকানায় বৈঠক করে, ভুট্টোর খপ্পরে পড়েন। **১** লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন, শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। কিন্তু ইয়াহিয়া কিছুই করতে পারছেন না। ভুট্টোর খপ্পরে আছেন তিনি, ভুট্টোকে দেখানো হয়েছে চতুর বানর হিসেবে।

রেবতীভূষণের অনবদ্য আরেকটি কার্টুন ২৪ এপ্রিল ছাপা হয়েছে *যুগান্তরে*। শিরোনাম— 'মদত'। পাকিস্তান বা ইয়াহিয়া গণহত্যার উল্লাসে মত্ত। তার পানপাত্রে পানীয় ঢেলে দিচ্ছেন মাও সে তুং। চীন গণহত্যায় মদত দিচ্ছে পাকিস্তানকে। রেবতীভূষণ পশু পাখির রীতিবদ্ধ ড্রইংয়ে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তার প্রায় সব কার্টুনেই একটি চরিত্র থাকবে পশুর আদলে। এখানে মাও এর যে স্কেচ করেছেন তাতে তা পরিস্ফুট।

'ব্যস্ত সাহেবের মস্ত কুকুর।' ইন্দিরা [ভারত] মা'র সঙ্গে শিশু [বাংলাদেশ], সাহেবরা [আমেরিকা ও পাশ্চাত্য] বেরিয়েছেন পথ ভ্রমণে। হাতে ছিল কুকুরের শেকল। কুকুরটি হচ্ছে পাকিস্তান। খোসগল্পে ভারত মেতে আছেন। শেকল খসে পড়েছে হাত থেকে। আর কুকুর হঠাৎ ছাড়া পেয়ে আক্রমণ

করেছে শিশুটিকে। উদ্বিগ্ন মা সাহেবদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছেন। ঐ সময় ভারত বাংলাদেশ সমস্যার প্রতি সবার বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছিল। কিন্তু তারা বিষয়টিকে উপেক্ষা করছিল।

কথা কও কথা কও; ১৩ জুন ১৯৭১, যুগান্তর/ রেবতী ভূষণ

ঐ ঘটনার ধারাবাহিকতায় ৬ জুন আঁকেন *[যুগান্তর]* 'অরণ্যে রোদন' নামে কার্টুনটি। মনে হচ্ছে একটি বন, বৃক্ষগুলি হচ্ছে নিক্সন, মাও সে তুং ও পাশ্চাত্যের রাজনীতিবিদরা। নিজস্ব অনড় ভঙ্গিতে বৃক্ষরাজি দাঁড়িয়ে। ভারতের মানবতাবাদী জাতীয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ গেছেন তাদের কাছে বাংলাদেশের বিষয়ে সমর্থন আদায়ে। কেউ তাঁকে পাত্তা দিচ্ছেন না। কী ড্রইং! চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে তাদের চরিত্র।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে আরেকটি কার্টুন 'কথা কও কথা কও'। ১৩ জুন *যুগান্তর*-এ ছাপা। বিশ্ব বিবেক বসে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে কোনো প্রাণী। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিশ্ব নেতাদের কাছে যাচ্ছেন বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ে। তারা উপেক্ষা করছেন শরণকে। তিনি বারবার তাদের অনুরোধ জানাচ্ছেন প্রতিবাদ জানাতে। বিশ্ব বিবেক নিশ্চুপ। সে সময়ের ভারত ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চমৎকার রূপায়ণ।

ভারতে রাজনৈতিক কার্টুন চর্চা-য় সুমিত ঘোষ লিখেছেন রেবতী ভূষণ সম্পর্কে— "তাঁর চিত্রাঙ্কনের দোষ ধরতে অতি বড় ছিদ্রান্বেষীও ব্যর্থ হবেন।

তাঁর আঁকা ছবি হল তাঁর প্রাণের উচ্ছ্সিত আবেগের প্রকাশ। বেরতীভূষণের অঙ্কন কৌশল লক্ষ করলে দেখতে পাই— এক. তাঁর অঙ্কিত রেখার স্বচ্ছন্দ গতি। কলমের চেয়ে তুলির আঁচড়েই তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য। দুই. ছবির বিষয়বস্তুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় তিনি বাস্তব পরিবেশ-কে ফুটিয়ে তুলতেন। তিন. চরিত্রগুলির মুখের হাবভাব, কটাক্ষপাত বা চিত্তক্ষোভ প্রকাশের চিত্রভাষা তাঁর আয়ত্ত। চার. তিনি ছিলেন সঙ্গীত প্রিয়। তাই তাঁর ছবিতেও পাই ছন্দের আমেজ। পরিশেষে, তাঁর কার্টুনে আছে শুধু কৌতুক ও রগড়। কোন রকম তিক্তশ্লেষ বা ক্রোধ বা ঘৃণা প্রকাশ পায়নি কোনও কার্টুনে।"

সবশেষে উল্লেখ করব নরেন রায় [১৯৩৬-২০০৩]-এর কথা। সুফি নামে তিনি কার্টুন এঁকেছেন। কার্টুনিস্ট হিসেবে পূর্বোল্লিখিতদের মতো তাঁর নাম ডাক ছিল না বটে কিন্তু ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অক্লান্ত যোদ্ধা। *যুগান্তরে* 'অব্যর্থ' শিরোনামে [স্পেস]-এ প্রায় প্রতি সপ্তাহেই তিনি কার্টুন এঁকেছেন।

৭ মার্চ দেখি ভূট্টোকে তিনি উপস্থাপন করেছেন গণহত্যাকারী রূপে। হ্যাঁ, ১ মার্চ থেকেই বেসরকারিভাবে গণহত্যা শুরু হয়েছিল। পরে ২৫ মার্চ তা সরকারি গণহত্যারূপে চিহ্নিত হয়। সুফি সেই ৭ই মার্চ গণহত্যা ও গণহত্যার নায়ক ভূট্টোকে চিহ্নিত করেছেন; দূরদর্শিতা বটে!

২০ এপ্রিলের কার্টুনে মন্তব্য 'প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ শুনুন।' গণহত্যা শুরু হয়েছে। বিশ্বে তার খবর ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু পাকিস্তান রেডিও থেকে বারবার বলা হচ্ছে ঢাকার অবস্থা স্বাভাবিক। ঢাকার খবর পাঠক তা বলতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ তার পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে।

১৯৭১ সালে সুফির সেরা কার্টুন 'উদ্বাস্তু'। একই সঙ্গে সেখানে এককালীন পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অবস্থা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে নকশালদের কারণে অস্থির অবস্থা। নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছেন সবাই। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গে আগুন জ্বলছে, গণহত্যা চলছে। শরণার্থীরা আশ্রয়ের খোঁজে সীমান্ত অতিক্রম করছেন। আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় একটি কার্টুন 'আমাদের বাঁচাবে কে?' [*যুগান্তর* ৩০ এপ্রিল]। কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস সবখানে সংঘাত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ। এ সমস্ত সংঘাত সুপার পাওয়ারদের স্বার্থের কারনে। বাংলাদেশের মানুষের প্রশ্ন এ পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বাঁচাবে কে?

৩০ এপ্রিল ১৯৭১, যুগান্তর/ সুফি

সুফির আরেকটি কার্টুনের উল্লেখ করতে চাই। ১৭ জুন *যুগান্তরে*- এ ছাপা হয়েছিল। বিশ্বব্যাংক পাকিস্তানকে তখন সাহায্য না দেওয়ার সুপারিশ করেছে। অনেক সংকটে পাকিস্তান। ভাঙারির বেশে রাস্তায় নেমেছেন ইয়াহিয়া টাকার খোঁজে, সুর করে বলছেন 'শিশি, বোতল ভাঙা, পুরনো কাগজ, পাকিস্তানী ৫০০ টাকা, ১০০ টাকার নোট বিক্রি'ই...।'

সুফি যে সব কার্টুন একেঁছেন ১৯৭১ সালে তার একটা বড় অংশ ইয়াহিয়াকে নিয়ে। কামরুল হাসানের মতো ইয়াহিয়ার মুখাবার স্টাইলাইজড। সুফি প্রতিদিনের ঘটনার অভিঘাতের সরল বর্ণনা দিয়েছেন।

সামগ্রিকভাবে, সব কার্টুনিস্টরা ইয়াহিয়াকেই বেছে নিয়েছেন কার্টুনের কেন্দ্রে। তাঁকে এঁকেছেন রীতিবদ্ধ রীতিতে। [দেখুন ইয়াহিয়া প্রতিকৃতি]।

সুফি

চণ্ডী

পীর আলী

রেবতীভূষণ

অমল

কুট্টি

কামরুল হাসান

গারল্যান্ড

সঞ্জয়

আবু আব্রাহাম

কেই থওয়েইট

ইউনুস

তবে, এর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কামরুল হাসানের ড্রইং। প্রকৃত ইয়াহিয়ার রূপটি তিনিই ধরতে পেরেছেন।

সংগৃহীত কার্টুনগুলোর সময়কাল মূলত একাত্তরের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস থেকে শুরু করে একাত্তরের একেবারে শেষ পর্যন্ত। সংগ্রহের অধিকাংশ পত্রিকাই প্রকাশিত হয়েছে কলকাতা থেকে। যেসকল পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে কার্টুনগুলো সেগুলি হচ্ছে : *যুগান্তর*, *আনন্দবাজার*, *দেশ*, *স্বরাজ*, *সাপ্তাহিক দর্পণ*, *বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা*, *জয়বাংলা*, *সাপ্তাহিক বিপ্লবী বাংলা*, *সাপ্তাহিক সংগ্রামী বাংলা*, *সাপ্তাহিক রণাঙ্গন*। অধিকাংশ কার্টুনই মূলত তিনটি পত্রিকার: *যুগান্তর*, *আনন্দবাজার ও দেশ*। *যুগান্তর*, *আনন্দবাজার*, *অমৃতবাজার* পত্রিকায় অনেকসময় একই কার্টুন প্রকাশিত হয়েছে, এখানে সেগুলো *যুগান্তরের* নামেই দেয়া হয়েছে। কার্টুনিস্টদের মধ্যে আছেন : সুফি, চণ্ডী, অমল, রেবতী ভূষণ, পীর আলী, কুট্টি, শৈল চক্রবর্তী। মূলত সুফি, অমল ও রেবতী ভূষণের কার্টুন *যুগান্তরে* প্রকাশিত হয়, কুট্টির কার্টুন *দেশ* পত্রিকায়, এবং চণ্ডীর *আনন্দবাজার*-এ।

৬

আমরা যতগুলি কার্টুন সংগ্রহ করেছি, ব্যক্তিগতভাবে তার মধ্যে আনোয়ার আহমদের [ইংরেজি বানান এনভার আহমদ] কার্টুনগুলিই আমার কাছে ইতিহাসের উপাদান হিসেবে উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে। এনভার [ইংরেজি বানানটিকেই অনুসরণ করছি] যে ভাবে বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯টি কার্টুনের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন তা অনবদ্য।

এনভারের জন্ম রাওয়ালপিন্ডিতে ১৯০৯ সালে। লাহোর সরকারী কলেজ থেকে পাশ করে এক চিনিকলে রসায়ন বিশ্লেষকের চাকুরি নেন। অর্থাৎ তিনি স্বশিক্ষিত। ভারত বিভক্তির আগে আবার চাকুরি বদল করে দৈনিক *পাইয়োনিয়ার* পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বিভাগে চাকুরি নেন। তারপর *ডন* পত্রিকায়। *ডন* বের হতো লখনৌ থেকে। ১৯৪৭- এর পর তা স্থানান্তরিত হয় করাচিতে। *ডন* ছিল মুসলিম লীগের সমর্থক।

এ কারণেই, *ডন*- এর চাকুরি বেশিদিন পোষায়নি এনভারের। তিনি ১৯৪৫ সালে যোগ দেন *হিন্দুস্থান টাইমস*-এ।

এনভার দ্বিজাতি তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। *ডন*- এ থাকার সময় মুসলীম লীগ এ বিষয়ে তাঁকে অভিজ্ঞ হতে সহায়তা করে। রাওয়ালপিন্ডিতে জন্ম এবং মুসলমান হয়েও তিনি পাকিস্তান যান নি।

এনভার সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি, কিন্তু অনুমান করছি *হিন্দুস্থান*

টাইমস- এ তিনি কার্টুন আঁকা শুরু করেন এবং পরিচিত হয়ে ওঠেন। সাম্প্রতিক কোনো ঘটনা কার্টুনিস্ট—কে উদ্বেলিত করে, তিনি কার্টুন আঁকেন। কিন্তু এনভারের বৈশিষ্ট হচ্ছে উপমহাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল গভীর এবং ইতিহাসের প্রেক্ষাপটেই তার কার্টুনগুলি আঁকা। দেশ, এর ইতিহাস, গতি প্রকৃতি তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন ঘটে যাওয়া ঘটনা ভিত্তি করে। ১৯৪৫-৪৭ এবং পরবর্তীকালে ভারত-পাকিস্তান বিরোধ নিয়ে তিনি যে কার্টুনগুলি এঁকেছিলেন সেগুলি সম্পর্কে সুমিত ঘোষ মন্তব্য করেছিলেন- তাঁর আঁকা কার্টুনগুলির "আইডিয়ার অভিনবত্বে, নাট্য মুহূর্ত সৃষ্টির উদ্ভাবনে ও রূপকগুলির লক্ষণাবৃত্তির প্রতিফলনে সে যুগের পাঠক নিশ্চয় মুগ্ধ বা মুসলিম লিগের ভক্তরা রাগে অন্ধ হয়েছিলেন। এমন যুক্তিযুক্ত কার্টুন কিন্তু ভারত কার্টুন কলা- ভাণ্ডারে বেশি নেই।"

এই মন্তব্য প্রযোজ্য বাংলাদেশ সম্পর্কিত কার্টুনগুলির। কার্টুনগুলির তারিখ বা উৎস নেই। হতে পারে আহমদের কার্টুন সংকলন *Political Pot-pouri* থেকে নেয়া হয়েছে। আহমদ কি বিভিন্ন সময় এগুলি এঁকেছিলেন? নাকি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ১৯টি কার্টুন দিয়ে পূর্ববঙ্গ/ পূর্বপাকিস্তানের অবস্থা বোঝাতে চেয়েছিলেন? ১৯ টি কার্টুনের মধ্যে একটি পরম্পরা আছে। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে এক অদ্ভূত দেশের সৃষ্টি। লক্ষ্য করুন, পাকিস্তান পূর্বাঞ্চলের নাম ছিল পূর্ববঙ্গ [১৯৫৬ পর্যন্ত]। পুরণো নাম। কিন্তু সিন্ধু, বালুচিস্তান, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব মিলে সৃষ্টি হয়েছিল একটি একক পশ্চিম পাকিস্তান, নতুন নামকরণ। পাঞ্জাবিরা সেখানে আধিপত্য বিস্তার করেছিল তাই পশ্চিম পাকিস্তান-কে এক পাঞ্জাবের প্রতীকেই তুলে ধরেছেন। পূর্ববঙ্গ নারী এবং দম্পত্তি-তে যেমন পুরুষ আধিপত্য বিরাজ করে, এখানেও পাঞ্জাবিরা আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

১৯৪৭, ১৯৫৪, ১৯৫৮, ১৯৬৯, ১৯৭০ ও ১৯৭১— বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রতিটি মাইল ফলক বা ঐতিহাসিক ঘটনা তুলে ধরেছেন। মোটা তুলির কাজ কিন্তু কার্টুনের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

ইয়াহিয়া বা ইন্দিরার চেহারা রীতিবদ্ধ কিন্তু স্পষ্ট চেনা যায়। ইতিহাস বা উপন্যাসের চরিত্র প্রতীক হিসেবে ব্যবহারে অভিনবত্ব আছে যেমন, রাজা ক্যানুট বা এলিস। অতীতকে বর্তমানে নিয়ে আসা খুব সহজ নয়। কার্টুনের একটি বিশেষত্ব এর শিরোনাম। এখানেও এনভার অনন্য। বিশেষভাবে ১৯টি কার্টুন ধারাবাহিক সংকলিত হলো, কারণ, এ কার্টুনগুলো একত্রে দেখলে মনে হবে বাংলাদেশের ইতিহাসের পথ পেরিয়ে এলাম। এনভার মৃত্যুবরণ করেন ১৯৯২ সালে।

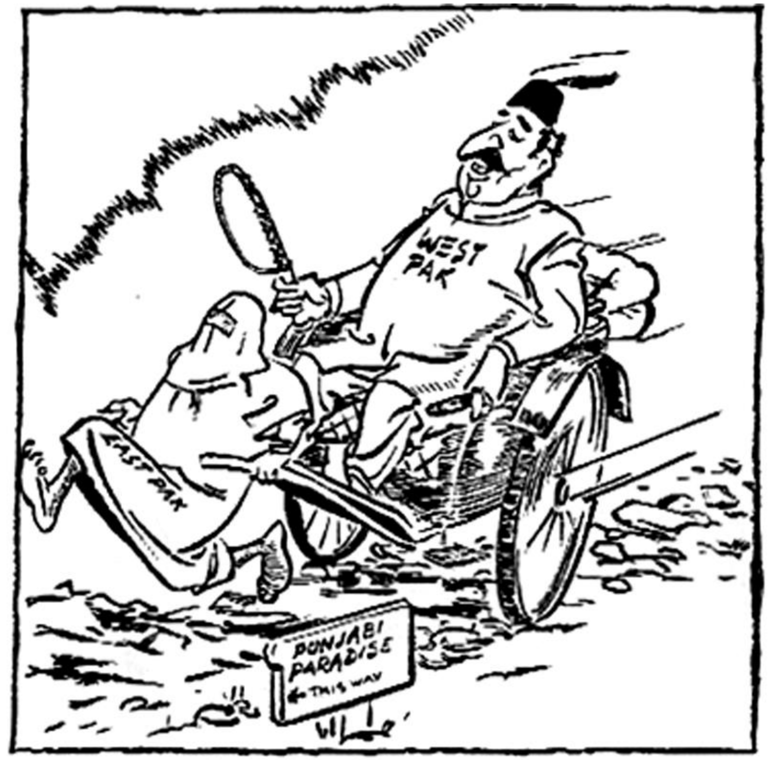

AFTER THE HONEYMOON

মধুচন্দ্রিমার পর/ আহমেদ

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আঁকা আবু আহমেদের কার্টুনের সংখ্যা ৫০ এর উপর। এর সবগুলিই প্রকাশিত হয়েছিল *ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস- এ*। রসগ্রাহী কার্টুন বলতে যা বোঝায় তা একেঁছেন আবু আব্রাহাম-ই।

আত্তুপুরাণা ম্যাথু আব্রাহামের জন্ম কেরালার তিরুভিল্লা শহরে ১৯২৪ সালে। তিন বছর বয়সেই নাকি তিনি কার্টুন আঁকতে শুরু করেন। এই তথ্যটি হয়তো অতিরঞ্জিত, তবে বলা যেতে পারে অল্প বয়সেই তিনি আঁকাআঁকি শুরু করেন যদিও কোনো আর্ট স্কুল থেকে প্রশিক্ষণ তিনি নেননি।

১৯৪৫ সালের দিকে মুম্বাই এসে *দি বোম্বে ক্রনিকলে* সাংবাদিক হিসেবে যোগ দেন। আর *ব্লিৎজ ও সেন্টিনেল* পত্রিকায় কার্টুন আঁকতে থাকেন। দিল্লি থেকে কার্টুনিস্ট শংকর তখন বের করতেন *শংকরস উইকলি*। আব্রাহামের

কার্টুন চোখে পড়ার পর তিনি তাঁকে দিল্লি ডেকে নেন, *শংকরস উইকলি*-তে যোগ দেন আবু। ১৯৫৩ সালে তার সঙ্গে দেখা হয় লন্ডনের *স্টার* পত্রিকার ফ্রেড ক্রসের সঙ্গে। তিনি তাঁকে লন্ডন চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। ১৯৫৩ সালে আব্রাহাম লন্ডন চলে যান।

লন্ডনে বিভিন্ন পত্রিকায় কার্টুন আঁকা শুরু করেন। তখন তিনি আব্রাহাম নামে স্বাক্ষর করতেন। ১৯৫৬ সালে লন্ডনের *সানডে অবজারভারে* যোগ দেন রাজনৈতিক কার্টুনিস্ট হিসেবে। সম্পাদক ডেভিড অ্যাস্টর তাঁকে পরামর্শ দেন আব্রাহাম নামটি বাদ দিতে। তখন তিনি আবু নামে স্বাক্ষর শুরু করেন। পরে আবু আব্রাহাম।

এক যুগ লন্ডনে ছিলেন তিনি এবং ষাটের দশকের উন্মাদনার ছোঁয়া লেগেছিল তাঁর মনে। সিরিয়ান খৃস্টান হলেও আদতে ছিলেন নাস্তিক, দৃষ্টিভঙ্গিতে বৃটিশ, আর মন ভারতীয়। *অবজারভার* ছিল খানিকটা রক্ষণশীল। তাই তিনি ১৯৬৬ সালে চাকুরি নেন *গার্ডিয়ানে* যা ছিল প্রগতিশীল। এর কারণ ষাটের দশকের রাজনীতি ও সংস্কৃতি। ভিয়েতনামের ওপর কার্টুন এঁকে তখন তিনি খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। তাঁর মৃত্যুর পর *গার্ডিয়ান* লিখেছিল "His strongest theme as India sank faster into factional and religious politics, had remained adherence to the original version of Mahatma Gandhi and Nehru for a wholly secular state : Abu was rationalist and atheist.''

গার্ডিয়ান আরো উল্লেখ করেছিল তাঁর কার্টুন হচ্ছে- "The conscience the left and the pen under the princes Matters."

গার্ডিয়ানে ছিলেন ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত। তারপর ফিরে আসেন ভারতে এবং যোগ দেন *ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে*। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত কাজ করেছেন সেখানে।

তিনি যখন ভারতে ফিরে এসেছেন তখন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। ভারতীয় রাজনীতি নিয়ে কার্টুন এঁকে যখন দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন তখন পাকিস্তান সংকট শুরু হয়েছে। আবু পাকিস্তান পছন্দ করেননি। তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে, স্বাভাবিকভাবেই তিনি সমব্যাথী ছিলেন বাংলাদেশের মানুষের আশা আকাঙ্খার প্রতি।

বাংলাদেশ নিয়ে তাঁর প্রথম কার্টুনটি প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালের ১০ অক্টোবর। এর শিরোনাম 'সংবিধান রচনা' বা 'রাইটিং অফ দি কন্সটিটিউশন'।

MAN AND WIFE ARE ONE IN THE EYES OF THE LAW

আইনের চোখে পুরুষ ও তার স্ত্রী একই জন/আহমেদ

এ কার্টুনে পাকিস্তানের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দুই রাজনীতিবিদকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে— মুজিব ও ভূট্টো। ১৯৭১ সাল থেকে যুক্ত হয়েছেন ইয়াহিয়া খান। ১৯৭০-৭১ সালে আবুর কার্টুনে এ তিনজনই মুখ্য চরিত্র। তবে, ব্যঙ্গের কারণে প্রধান হয়ে উঠছেন ভূট্টো ও ইয়াহিয়া। শেষোক্তজনের কার্টুনে আবির্ভাব ঘটে ৮ ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে। এর আগের দিন ভোট হয়। এবং ভোট কেন্দ্রে দেখা যাচ্ছে ইয়াহিয়ার মুখ। বাঙালিকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে ভোট কাকে দিতে হবে। আর জীর্ণ পোষাক পড়া বাঙালি তার রায় লুকিয়ে রাখছে ইয়াহিয়ার রক্ত চক্ষু থেকে। ভোটের পরদিন রায় গেছে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে। আবু আঁকলেন ইয়াহিয়াকে মুখ্য করে এবং তাঁর উক্তি—See you give them adult franchise and before you know where you are, they start behaving life adults. এই মন্তব্যের কারণ, ভোটে জিতে

বাঙালি শৃঙ্খল মুক্তির স্বাদ পেয়েছে এবং পাকিস্তানের বিপরীতে ভারতের বন্ধুত্ব চাইছে যেটি পাকিস্তানের নাপছন্দ। বঙ্গবন্ধু/বাঙালির হাতের প্ল্যাকার্ডে লেখা 'ফ্রেন্ডশিপ উইথ ইন্ডিয়া'। আবু-কে ইঙ্গিত করতে চাইছিলেন, অন্তিম মুহূর্তে ভারতকেই দরকার হবে বাঙালির।

৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিচ্ছেন আর আবুর কার্টুনে দেখা যাচ্ছে ভুট্টো ইয়াহিয়াকে পরামর্শ দিচ্ছেন বাংলাদেশ আক্রমণে যা ঘটে ২৫ মার্চ মধ্যরাতে। এ পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কার্টুন ১১ মার্চের।

কায়েদে আযমের ভাস্কর্য। তার ভিত্তি গাত্রে লেখা আছে অথার অব দি টু নেশন থিয়োরি বা দ্বিজাতি তত্ত্বের জনক। বঙ্গবন্ধু নির্বাচনে জিতে স্বাধীনতার দিকে যাচ্ছেন [আবু এ বিষয়ে নিশ্চিত, অন্যেরা নয়]। এ কারণে, বঙ্গবন্ধু সেই ভিত্তি গাত্রে দ্বিজাতি তত্ত্ব কেটে লিখেছেন ত্রিজাতি তত্ত্ব। অর্থাৎ কায়েদে আযম আসলে দ্বিজাতি নয় ত্রিজাতির কথাই বলেছিলেন। লক্ষ্যণীয়, ঐ সময় অন্যান্য কার্টুনিস্টরা যা ভাবছেন, আবু তা থেকে এগিয়ে আছেন। ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করছেন ইতিহাসের অভিজ্ঞতায়, এটিই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

দেখেছো, সর্বজনীন ভোটাধিকার তাদের দিয়েছ, এবং তুমি কোথায় বুঝে ওঠার আগেই তারা সাবালকের মতো ব্যবহার করছে; ৯ ডিসেম্বর ১৯৭০, দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস/ আবু আব্রাহাম

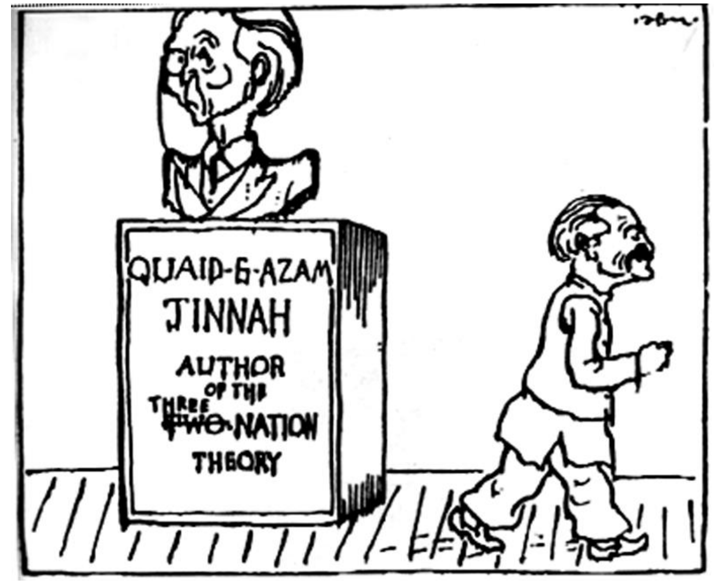

১১ মার্চ ১৯৭১, দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস/ আবু আব্রাহাম

ইতিহাসের আলোকে বিচার করা আবুর আরেকটি কার্টুন প্রকাশিত হয় ৬ এপ্রিল। কার্টুনের বিষয় দুই চীনা নেতা মাও সে তুং ও চু ইন লাই বাংলাদেশে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছেন। ইয়াহিয়া প্রকাশ্যে বলেছিলেন, কয়েক হাজার হত্যা করো দেখবে বাঙালিরা কবুতরের মতো হাত থেকে ধান খুঁটে খাচ্ছে। কিন্তু, বাঙালি দমিত হয়নি। বরং চারদিকে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। মাও বলেছিলেন, বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস। এখন সে মন্তব্য সংশোধন করে চীন বিপ্লবের দুই নেতা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন পাকিস্তানি বন্দুকই বাঙালির ক্ষমতার উৎস। অর্থাৎ, বাঙালি দমিত হবে না বরং হয়ে উঠবে শক্তিশালী।

২৩ মে'র কার্টুনটির কথাও বলা যেতে পারে। কার্টুনের শিরোনাম 'টিল হার ডেথ ডু আস এপার্ট'। খৃস্টিয় বিয়ে। পুরোহিত হবু স্বামী-স্ত্রীকে লক্ষ্য করে এই উক্তি করেন, যে, আজীবন তারা একত্রে থাকবেন। ভুট্টো এখানে পুরোহিত হিসেবে ইয়াহিয়াকে সেই উপদেশই দিচ্ছেন— বাংলাদেশকে যেন ছাড়া না হয়।

আবুর ২৫ জুলাইর কার্টুনটিও লক্ষ্যণীয়, যেখানে, ইয়াহিয়া ও ভুট্টো সমস্বরে গাইছেন, আমার সোনার ডলার। সোনার বাংলা নয়, মার্কিন ডলার বা সাহায্যই কাম্য।

৭

পশ্চিমবঙ্গে যারা কার্টুন এঁকেছেন সত্তর দশকে তাদের মধ্যে অমল চক্রবর্তী [জ. ১৯৩৬] অন্যতম যার কথা আগে উল্লেখ করেছি। তিনি প্রধানত *যুগান্তরের* জন্য কার্টুন এঁকেছেন। **১৯৭১** সাল সম্পর্কিত তাঁর অধিকাংশ কার্টুন *যুগান্তরে* প্রকাশিত হয়েছে। তবে, কিছু কার্টুন প্রকাশিত হয়েছিল *স্টেটসম্যান, টাইমস অব ইন্ডিয়া, অমৃত বাজার পত্রিকা,* ও *হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে*। তবে এমনও হতে পারে,*যুগান্তরে* নিয়মিত ছিলেন। সেখানে যে কার্টুন ছাপা হতো তা *ইংরেজি অমৃত বাজারে* ছাপা হতো। বাকীগুলি নতুন ভাবে হয়ত আঁকতে হয়েছে। অমলের [এই নামে স্বাক্ষর করেছেন] উল্লেখযোগ্য কিছু কার্টুনের উল্লেখ করছি।

এপ্রিল *টাইমস অব ইন্ডিয়ায়* অমলের কার্টুন 'ইন্টার্নাল অ্যাফায়ার' শিরোনামে একটি কার্টুন প্রকাশিত হয়। তখন সবেমাত্র গণহত্যা শুরু হয়েছে। কিন্তু বাঙালি অমল তখনই অস্থির হয়ে উঠছেন। কারণ, গণহত্যা-কেও পাকিস্তান অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলছে। বর্বর যুগের মানুষের মতো ইয়াহিয়ার হাতে গদা। এক মহিলাকে [বাংলাদেশ] চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাচ্ছে, ভোগ করে খুন করবে বলে। নিক্সন, পোদগর্ণি ও পাশ্চাত্যের নেতারা নির্লিপ্তভাবে অবলোকন করছেন, এমনকী ইন্দিরা গান্ধীও।

৮ এপ্রিল *অমৃত বাজারের* 'স্মাইল এ ডে' নামক স্পেসে প্রকাশিত হয় অমলের আরেকটি কার্টুন, বিষয়বস্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদর। ডিউটি চার্টে উল্লেখ আছে একদিকে স্টেন হাতে এক সেনা যার কাজ হত্যা। অন্যদিকে এক সিভিলিয়ান যার কাজ হচ্ছে চুরি। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল ইসলামাবাদ বাংলাদেশ থেকে সোনা ও টাকা নিয়ে যাচ্ছে। এখানে যে দুটি ফিগার এঁকেছেন সে দুটি ফিগারের সঙ্গে পরবর্তীকালে অমলের আঁকা কোনো ফিগারের মিল নেই। কার্টুনের আসল ব্যঙ্গাত্মক রূপটি এখানে প্রতিফলিত হয়েছে।

অমৃতবাজারে **১১** এপ্রিল ছাপা হয় 'ইস্ট ইজ রেড'। চীনা কমিউনিস্টদের সাফল্যের পর বলা হতো 'ইস্ট ইজ রেড'। এখন চীন ও পাকিস্তান পরম বন্ধু। ইয়াহিয়া গণহত্যা করে রক্তে রঞ্জিত করে ফেলছেন বাংলাদেশের মাটি আর মাও বলছেন 'গুড'। সমাজতন্ত্র নয় খুন-কেই প্রশংসা করছেন মাও। সমাজতন্ত্রের কী অধপতন!

স্টেটসম্যানে ছাপা হয়েছিল 'ইউ হ্যাভ গট এ প্রমোশন'। পাকিস্তানীরা হত্যা করলেই প্রমোশন পাচ্ছে। মেডেলের বদলে মাথার খুলি শোভা পাচ্ছে। কে কতো খুন করতে পারে সেনাদের মধ্যে তা চারিয়ে দেয়া হচ্ছে। হত্যা ব্যবহৃত হচ্ছে প্রণোদনা হিসেবে। এটিই অমল বোঝাতে চাচ্ছেন।

হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে ১০ ডিসেম্বর ছাপা হয়েছে ইয়াহিয়া ভুট্টো দূরবিন দিয়ে দেখছেন। তাদের মনে একটিই চিন্তা ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। অনেক দূরের বাংলাদেশকে দূরবীন দিয়ে দেখে তাদের মনে হচ্ছে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারিরা আরেকটি ঘাটি করে নিল। আজীবন অবশ্য তারা এটিই ভেবেছে। বাংলাদেশ তখনও মুক্ত হয়নি। সে জন্য ভারতীয়দের ভাবা হচ্ছে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে।

ইয়াহিয়ার দর্শন, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১, দি টাইমস অব ইন্ডিয়া/ অমল

টাইমস অব ইন্ডিয়াও প্রকাশ করে অমলের একটি কার্টুন, মুক্তিযুদ্ধের আসন্ন জয় তাঁকে এতো অনুপ্রাণিত করেছিল যে, তিনি একদিনেই তিনটি কার্টুন এঁকেছিলেন। এই কার্টুনটিতে দেখা যাচ্ছে মাও সে তুং 'থটস অব ইয়াহিয়া' পড়ছেন। এতদিন মানুষ পড়েছে 'থটস অব মাও সে তুং' যেখানে তিনি কমিউনিজমের কথা বলেছেন। ইয়াহিয়ার চিন্তাতো গণহত্যা। এ কার্টুন আঁকার কারণ ৯ ডিসেম্বর বেইজিংয়ে চীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী এমনকী পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত সবাই ভারত বিরোধী বক্তৃতা দেন। চৌ এন লাই সাংবাদিকদের বলেন— "ভারতীয় আক্রমণকারীরা শীঘ্রই পরাজয় বরণ করবে।" যদিও যৌথ বাহিনী তখন বাংলাদেশের অনেক জায়গা মুক্ত করেছে।

ভূট্টোর পরিণতি দেখিয়েছেন অমল ২০ ডিসেম্বর *অমৃত বাজারের* কার্টুনে। বীরদর্পে ভূট্টো ঢুকছেন জাতিসংঘে। তার যুক্তিতে কেউ কান দেয়নি। ভূট্টো তার হাতের কাগজ ছিঁড়ে সভাকক্ষ ত্যাগ করেছিলেন। দু'স্তরের কার্টুনে চমৎকারভাবে তা প্রতিফলিত হয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। ভূট্টো কী করবেন? তোতা পাখির মতো তিনি নানা কথা বলছেন— শিথিল ফেডারেশন, কনফেডারেশন, দুটি প্রদেশ থাকবে, এক পাকিস্তান, ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান। শেখের সঙ্গে আরেকবার বৈঠক। তোতা পাখি শেখানো বুলি কপচায়। তার পা দাঁড়ের সঙ্গে শেকলে বাঁধা। অর্থাৎ, ভূট্টো দিশেহারা। তোতার মতো শেখানো বুলি কপচাচ্ছেন। কিন্তু, তখনও তো তিনি ক্ষমতায় যান নি।

অমলের শেষ কার্টুনটি ছাপা হয়েছে ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি। তবে, তা মামুলি ধরণের। অমল একই সঙ্গে তখন ভারতীয় রাজনীতি নিয়েও কার্টুন এঁকেছেন।

রাজনীতি সচেতন না হলে কার্টুন আঁকা কষ্টকর। শুধু তাই না এক ধরণের পক্ষপাতও হয়ত কাজ করে তার মনে। আবু আব্রাহামের মতো অমলও রাজনীতি সচেতন। আবু আব্রাহামের মতো হয়ত এতো তীক্ষ্ণ নন। কিন্তু, আবার ভারতীয় বিষয়ে তাঁর রসবোধ তীক্ষ্ণ।

এরপর আসে চণ্ডী লাহিড়ীর প্রসঙ্গ। ১৯৭১ সালে স্বাভাবিকভাবেই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তিনি এঁকেছেন। কিন্তু যতো কার্টুন তাঁর আঁকার ছিল তত আঁকেননি। বা এঁকেছেন, আমরা হয়ত তা সংগ্রহ করতে পারি নি। তাঁর আঁকা প্রথম কার্টুনটি [বাংলাদেশ সম্পর্কিত] পাই ১২ এপ্রিল। দীর্ঘ বিরতির পর ১৮ সেপ্টেম্বর *হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে* ছাপা হয় গভর্ণর মালেক-কে নিয়ে যিনি বাংলাদেশে তখন পরিচিত ছিলেন 'ঠ্যাটা মালেইক্কা' নামে। গভর্ণর মালেক-কে নিয়ে চণ্ডী ছাড়া আর কেউ আঁকেন নি। এর অংকনরীতিও দেখার মতো। স্পেস ভরাট না করে একজনের কাঁধে বসিয়ে দেয়া হয়েছে ডা. মালেক-কে চোখে কালো চশমা। কার্টুনের বক্তব্য হলো, গণহত্যা চলছে নিয়মিত 'পূর্ব পাকিস্তান'—এ যেখানে তিনি গভর্ণর কিন্তু তার চোখে পড়ছে না কারণ তিনি তো অন্ধ। ডা. মালেক ছিলেন চোখের ডাক্তার।

১ ডিসেম্বরের কার্টুনটিও উল্লেখযোগ্য এবং কৌতুকময়। ৩ ডিসেম্বর যুদ্ধ বাঁধবে দু দেশে। সবাই যুদ্ধের আশঙ্কা করছে। ইয়াহিয়াও, কিন্তু তিনি ভাবছেন ইন্দিরা সম্পর্কে যে, ঐ মহিলা যদি মনে করে আমাকে গরু পেটা করবে তা আমি মানতে পারি না। ঝাঁটা হাতে ইন্দিরা, অন্যহাতে ইয়াহিয়ার চুল মুঠি করে ধরা। রণরঙ্গিণী বেশ।

'নিজের কুয়োতে নিজেই ডুবে গেল।' হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড/ চণ্ডী

জাতিসংঘে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ বিরতি নিয়ে বিতর্ক চলছে। পাকিস্তান সুবিধা করতে পারছে না। 'পূর্ব পাকিস্তান'-এ যে ভাবে খুন খারাবি চালিয়েছিলেন, ইয়াহিয়া জাতিসংঘ-কেও সে রকম মনে করছেন, তিনি হুমকি দিচ্ছেন, জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলকে এ বলে যে, আমি তোমার পাসপোর্ট জব্দ করব। ইয়াহিয়ার বক্তব্য সমূহ যে কতো অসাড় এটিই কার্টুনের বিষয়।

১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি দেখা যাচ্ছে পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠছে। এই সূর্যটি মুজিব। পূর্বে উত্থান হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের যদিও তখনও তিনি বন্দী কিন্তু তার বাংলাদেশতো স্বাধীন।

চণ্ডীর শেষ কার্টুনটি খুব সম্ভব ভূট্টোর ক্ষমতা গ্রহণের পর আঁকা। নির্দিষ্ট তারিখ পাইনি। ইয়াহিয়া তার নিজের খোড়া কুয়োতে [বা পুকুরে] ডুবে যাচ্ছেন।

৮

মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল নিয়ে কুট্টির আঁকা তাঁর কার্টুনগুলি বিচার করা যেতে পারে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নিয়ে ইংরেজি কাগজে ছাপা ১৬টি কার্টুন সংগ্রহ করতে পেরেছি।

৭ জুন প্রকাশিত হয় ভূট্টোকে নিয়ে কুট্টির কার্টুন। ভূট্টোর মুখাবয়ব তিনি যা করেছেন তা অন্যান্য কার্টুনিস্ট থেকে আলাদা। কার্টুনে দেখা যাচ্ছে ভূট্টো ফোনে কথা বলছেন হয়ত ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে। সামনে পাহাড়াদার কুকুররূপী টিক্কাখান। হিংস্রতা ফুটে বেড়াচ্ছে তার চোখ থেকে। টিক্কাকে ইয়াহিয়া পাঠিয়েছিলেন বাঙালি নিধনের জন্য। তাকে আবার ফেরত আনা হয় তাড়াতাড়িই। এসব কিছুই করা হয়েছিল হয়ত ভূট্টোর কারণেই। তাই এখানে টিক্কাকে দেখানো হয়েছে ভূট্টোর বডিগার্ড হিসেবে যিনি কুকুরের মতো বিশ্বস্ত। ভূট্টো ক্ষমতায় এলে টিক্কাকে সেনাপ্রধান করেছিলেন।

২১ আগস্টের কার্টুনটিও মজার। দু'পাশে দুই মহিরুহ, রাশিয়ার পোদগর্ণি, আর চীনের মাও সে তুং। নিচে দুই ঝগড়াটে 'কিশোর'। ইয়াহিয়া ও শরণ সিং। ইয়াহিয়া হুমকি দিয়ে বলেছেন, আমার চাচা তোমার চাচাকে দেখে নিতে পারে।

ভূট্টোকে নিয়ে নির্মম রসিকতা করেছেন ১৮ সেপ্টেম্বর *হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড* পত্রিকায়। ভূট্টোকে এখানে দেখানো হয়েছে বুট পালিশঅলা অথবা সেনাবাহিনীর তাঁবেদার হিসেবে। ইয়াহিয়া তাকে হুকুম দিচ্ছেন তার বুট পালিশের জন্য।

একইভাবে উল্লেখ 'সম্রাটের নতুন পোষাক'। এটি ১৯ অক্টোবর ছাপা হয়েছিল *স্টেটসম্যানে*। হ্যান্স আন্ডেরসেনের গল্প রাজার নতুন পোষাক-কে এখানে রূপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ঠগবাজ একবার এক রাজাকে চমৎকার এক পোষাক বানিয়ে দেবে বলে চুক্তিবদ্ধ হয়। এক মাস ধরে শোনা গেল তার তাঁতের শব্দ, যদিও সেখানে কোনো সুতা ছিল না। কেউ এলে ঠগবাজ বলল তার প্রচণ্ড পরিশ্রম হচ্ছে এই আশ্চর্য পোষাকটি বানানোর জন্য। নির্দিষ্ট দিন রাজা এলেন, তাকে নগ্ন করে নতুন পোষাক পরিয়ে দিচ্ছেন এমন অভিনয় করলেন। বললেন বেশ মানিয়েছে। নগ্ন রাজা রাজপথে নামলেন। মানুষজন দেখছে তিনি নগ্ন কিন্তু তারাও বলছে কী চমৎকার! এদিকে ঠগবাজ তাঁতী টাকা পয়সা নিয়ে হাওয়া। রাজা ইয়াহিয়া ঘোষণা করেছেন ডিসেম্বরে। এই সংবিধান যে রাজার নতুন পোষাকের মতো তা সবাই জানে। কিন্তু সবাই বিচলিত ইয়াহিয়ার চেয়ে তার চামচাদের যে চেহারা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তা অনবদ্য। সুদৃঢ় রেখা। কনট্রাস্টের জন্য দাড়ি, মুকুট, টুপি, বা রাজদণ্ড কালো। সামরিক বাহিনীর চামচাদের নিয়ে এরকম কার্টুন খুবই আঁকা হয়েছে।

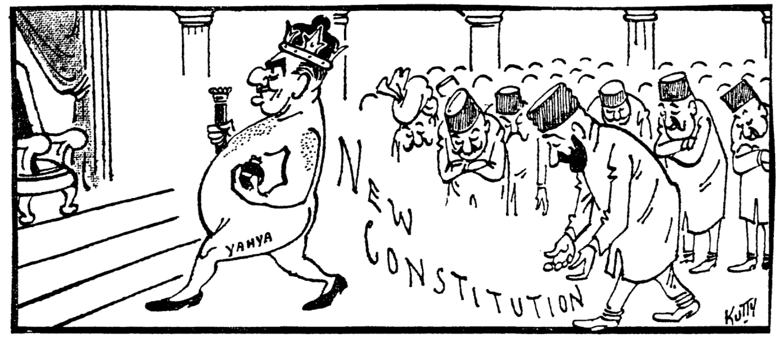

THE EMPEROR'S NEW ROBE

সম্রাটের নতুন পোষাক; ১৯ অক্টোবর ১৯৭১, দি স্টেটসম্যান/কুট্টি

নিক্সনকে ইয়াহিয়া বা পাকিস্তান সামরিক জুন্তার সবসময় আলাদীনের প্রদীপের দৈত্যের মতো মনে হয়েছে। চাইলেই তাকে নির্দেশ দেয়া যায়। এবং নিদের্শ অনুযায়ী সে কাজ করে। যুদ্ধ বেঁধেছে পশ্চিম সীমান্তে ভারত পাকিস্তানের। বিপদে আছে পাকিস্তান। সহায়তা চাইছে চেরাগের দৈত্য নিক্সনের কাছে। কিন্তু এই প্রথম নিক্সন চিন্তা করছেন, কারণ তিনি সফল হবেন না। এর একটিই কারণ রুশ ভেটো। চমৎকারভাবে সেই সময়টি প্রতিফলিত হয়েছে ৯ ডিসেম্বরের কার্টুনে।

ভূট্টোকে নিয়ে ২২ ডিসেম্বরে একটি কার্টুন প্রকাশিত হয় পাকিস্তান বা পাকিস্তান বাহিনী নিজেদের বাঘ হিসেবে তুলে ধরত। ১৬ ডিসেম্বর তার মৃত্যু হয়। ভুট্টো এই বাঘকে প্রাণ দিতে না পারলেও সংরক্ষণ করতে চান। তাই বাঘের লেজ ধরে ক্লান্ত ভূট্টো টেনে নিচ্ছেন ট্যাক্সিডারমিস্ট বা মৃত পশুর সংরক্ষণের কাছে। এই ট্যাক্সিডারমিস্টরা হলো চিন ও পাকিস্তান। ভূট্টোকে নিয়ে আরো কিছু কার্টুন একেছেন কুট্টি। বাংলাদেশ নিয়ে তার সর্বশেষ কার্টুনটি প্রকাশিত হয়েছিল ৭ জানুয়ারি ১৯৭২।

মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। তালি মারা ধুতি পাঞ্জাবি পড়া বাঙালি বাবুটি পশ্চিমবঙ্গ যে প্রায় ফতুর। পঞ্চাশ কোটি টাকা তার বাজেট ঘাটতি। যদিও সে বলেছে এতদিন যা বলছে জয় বাংলা, জয় ইন্দিরা, জয় জওয়ান। ভিক্ষাপাত্র নিয়ে সে বেরিয়েছে।

রাশিপুরম কৃষ্ণস্বামী আয়ার লক্ষণ আমাদের কাছে পরিচিত শুধু আর কে লক্ষণ নামে। ভারতে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে খ্যাতিমান কার্টুনিস্ট। শুধু কার্টুনিস্ট বললে ভুল হবে, তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক ও বিভিন্ন ধরণের রচনার লেখক। কার্টুনের অ্যালবাম সহ তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৪০। তাঁর বড় ভাই আর কে নারায়ণও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন লেখক। দু

ভাই-ই ভারতের সর্বোচ্চ পদক ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন। আর কে লক্ষণ পেয়েছেন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার।

লক্ষণের জন্ম ১৯২১ সালে তামিলনাড়ুতে। তরুণ বয়স থেকেই এঁকেছেন। তারপর মুম্বাই এসে যোগ দেন *টাইমস অব ইন্ডিয়াতে*। সেখানে তাঁকে কার্টুন আঁকতে দেয়া হতো না। ইলাসট্রেশন করতেন। কিন্তু তার প্যাশন ছিল কার্টুন আঁকা। রাজনীতি সচেতন তো ছিলেনই, সাধারণের প্রতি মমত্বও ছিল অসীম। আত্মজীবনীতে ঐ সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন— "I felt that my intellectual capacity was getting atrophied and that was losing the sharp satirical perspective and eye for absurdity which form the son of a political cartoon." তার এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় কার্টুনের প্রতি তাঁর মনোভঙ্গি। আমরা ১৯৭১ সম্পর্কিত তার মাত্র সাতটি কার্টুন সংগ্রহ করতে পেরেছি।

ভারত-রুশ চুক্তির পর ইন্দিরার আত্মবিশ্বাস যেমন বেড়ে যায়, তেমনি পশ্চাত্যও শঙ্কিত হয়ে ওঠে। কিন্তু, তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ইন্দিরার পশ্চাত্যকেও দরকার। সে কারণে তিনি সফর করেন পশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ। রুশ ভল্লুক-কে নিয়ে তিনি প্লেনে উঠছেন, বিড়বিড় করে বলছেন, আমি সবাইকে জানাতে চাই তুমি [অর্থাৎ চুক্তি] কতোটা নিরীহ।

সব ঠিক হয়ে যাবে, যদি নিজের চরকায় তেল দাও।
৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড/ আর কে লক্ষণ

জাতিসংঘকে নিয়ে ঠাট্টা করা একটি কার্টুন আঁকেন ডিসেম্বরে। *হিন্দুস্থান স্ট্যাডার্ডে* তা প্রকাশিত হয় ৬ ডিসেম্বর। সেদিন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। জাতিসংঘে যুদ্ধ বিরতি নিয়ে আলোচনা চলছে, পাকিস্তানের মিথ্যাচারে সায় দিচ্ছে চীন আর আমেরিকা। নিক্সন সত্য চাপা দিতে চাইছেন, ভাবছেন 'সত্যবাবু' যদি অনুপ্রবেশ না করে নিজের মনে থাকে তাহলেই সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। জাতিসংঘে সত্যের স্থান নেই - এটি মূল বক্তব্য।

পূর্ব পূর্বই, পশ্চিম পশ্চিম-এই আপ্তবাক্য স্মরণে ২০ ডিসেম্বর সরল একটি কার্টুন আঁকেন। ইয়াহিয়া রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। সুতরাং পূর্ব পশ্চিম মিলবেনা। কারণ ইস্ট ইজ ইস্ট, ওয়েস্ট ইজ ওয়েস্ট অ্যান্ড নেভার দা টুইন শ্যাল মিট।

বাংলাদেশ নিয়ে শেষ কার্টুনটি ২৪ ডিসেম্বর ছাপা হয়েছিল। বাংলাদেশ নামক বিরাট বাস্তবতায় ধাক্কা পেয়ে নিকসন বা যুক্তরাষ্ট্র কুপোকাৎ। এমন অবস্থায় তাকে খুব কমই পড়তে হয়েছে। তাই লক্ষণ ক্যাপশন দিয়েছেন: নিকসন বলছেন, তুমি না বলেছিলে এটি আসল না।

কাশ্মীরি সুধীর দারের জন্ম ১৯৩১ সালে এলাহাবাদে। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থেকে সংবাদপত্রে যোগদেন। এক সময় *স্টেটসম্যানে* কার্টুন আঁকার ইচ্ছে ছিল, সুযোগ পান নি। সে সুযোগ দেন *স্টেটসম্যান* সম্পাদক। ১৯৬১ সালে সেই পত্রিকায় যোগ দিয়ে কার্টুন আঁকতে থাকেন। ১৯৬৭ সালে যোগ দেন *হিন্দুস্থান টাইমসে*। সেখানেই শেষ অব্দি ছিলেন। তিনি 'আউট অব মাই মাইন্ড' নামে ক্যাপশন ছাড়া কার্টুন আঁকতেন। ব্যক্তিকে তিনি সমালোচনা করেননি, আমলাতন্ত্র, দুর্নীতি প্রভৃতি ছিল তাঁর বিষয়। তাঁর সমকালীন কার্টুনিস্ট রাজেন্দ্র পুরি তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন দার রাজনৈতিক কার্টুনিস্ট নন, কারণ তিনি পলিটিকাল অ্যানিমল নন; হিউমার তার কাছে মুখ্য। "Pure humor of the many kind."

দারের প্রায় ১০টি কার্টুন সংগৃহীত হয়েছে। ২০১৯ সারে তিনি মারা যান। বাংলাদেশ নিয়ে তাঁর কার্টুনে একটু ব্যতিক্রম আছে। যেমন, ১২ ডিসেম্বরের কার্টুন। ইয়াহিয়া খাবার টেবিলে বসে আছেন। সামনে হাড়ের স্তুপ। বাঙালির হাড়। একাই বসে আছে। যুদ্ধ শেষ হবার পথে। শিরোনাম ভারতের সঙ্গে আলোচনার জন্য তৈরি। ডিসেম্বরের আরেকটি কার্টুন। ৩০ লাখের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন। মৃত মানুষের স্তুপের ওপর বসে আছেন ইয়াহিয়া। বলছেন, বাংলাদেশ মুক্ত, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ইয়াহিয়া ছাড়া কাউকে তিনি কার্টুনের বিষয় করেন নি। যাদের কথা আলোচনা

করেছি, তাদের মতো এসব কার্টুনে শ্লেষ অনুপস্থিত। ব্যঙ্গ হয়ত আছে খানিকটা।

এ ছাড়া *ব্লিৎস* ও *হিম্মত*- এ ভিন্স ও বরীন্দ্রনের কয়েকটি কার্টুন প্রকাশিত হয়েছে।

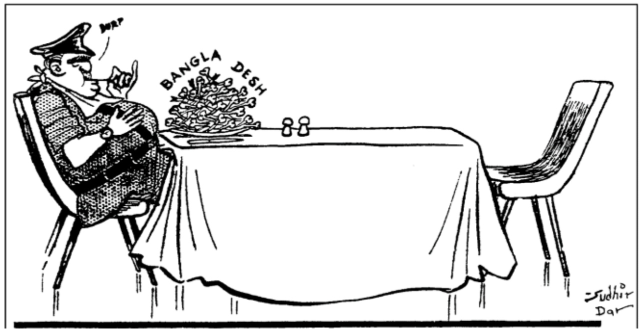

ভারতের সঙ্গে কথা বলার জন্য তৈরি।
১২ ডিসেম্বর ১৯৭১, হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড/ সুধীর দার

৯

ইংরেজি কাগজে প্রকাশিত বাংলাদেশের কার্টুনিস্টের সংখ্যা হাতে গোনা। *দি পিপল*-এ এঁকেছেন নয়ন এবং সাতুন, তাদের আসল নাম বা পরিচয় পাওয়া যায় নি। রেহমান সোবহান প্রমুখ সম্পাদিত *ফোরাম*-এ নিয়মিত এঁকেছেন রফিকুননবী। ১৯৭০ সালের ১৪ নভেম্বর থেকে ২০ মার্চ ১৯৭১ পর্যন্ত রফিকুননবীর ১০টি কার্টুন প্রকাশিত হয়েছিল।

রফিকুননবী বাংলাদেশের অন্যতম শিল্পী, এই এক কথাতেই তাঁর পরিচয় ফুরিয়ে যায় না। তিনি, ঔপন্যাসিক, প্রচ্ছদ শিল্পী, ইলাস্ট্রেটর এবং কার্টুনিস্ট। স্বাধীনতার আগে অনিয়মিত কার্টুন চর্চা করেছেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর তার সৃষ্টি কার্টুন 'টোকাই' নিয়মিত এঁকেছেন। সাধারণ্যে তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন রণবী হিসেবে।

রণবী লিখেছেন, "মানুষের ঘটনাবহুল জীবনের উপলব্ধি আর অনুভূতিগুলোকে গ্রাহ্য করার ব্যাপারটিও কার্টুনের প্রধান লক্ষ্য। তা' না হলে কার্টুন সম্পূর্ণ হতে পারে না। সমাজ সংসারের সবাই ভাবছে, চিন্তা করছে সেগুলোকে রসগ্রাহী করে উপস্থিত করাই কার্টুনের লক্ষ্য।"

ফোরাম-এ প্রকাশিত রণবীর কার্টুন গুলো ভিন্ন ধরণের। *ইলাসট্রেটিভ* কারণ সেগুলি প্রকাশিত হয়েছিল প্রচ্ছদে। তা'ছাড়া ফিগারগুলি কার্টুনাইজ হলেও

BURYING
THE MUSLIM LEAGUE

মুসলিম লীগ-কে কবর দেয়া হচ্ছে:
২৯ ডিসেম্বর ১৯৭০, সাপ্তাহিক ফোরাম/ রফিকুননবী

বোঝা যায় তিনি আর্ট কলেজে প্রশিক্ষিত। প্রতি সপ্তাহের প্রধান ঘটনা অবলম্বন করেই কার্টুনগুলি আঁকা। যেমন ১৯৭০ সালের ১৪ নভেম্বরের কার্টুন। নির্বাচন সামনে চারদিকে উত্তেজনা। বিভিন্ন দল নদীতীরে আর নৌকা এগুচ্ছে। সবার লক্ষ্য নৌকা ঠেকানো। ২৯ ডিসেম্বর। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ছাড়া সবাই হেরেছে। সবচেয়ে বড় হার মুসলিম লীগের। মুসলিম লীগ গোরস্থানে। শিরোনাম মুসলিম লীগকে কবর দেয়া হচ্ছে। শেষ কার্টুন ছাপা হয়েছে ২০ মার্চ। একদিকে সমাপ্ত ইয়াহিয়া খান, সামরিক বাহিনীর প্রতীক, অন্যদিকে আন্দোলনরত জনতা, নেতৃত্বে শেখ মুজিব, মুজিব শক্তিশালী, শিরোনাম শক্তির ভিত থেকে দরদস্তুর। বাঙালির এখনও আশা ছিল আলোচনার মাধ্যমে হয়ত সবকিছুর নিস্পত্তি হবে।

মোহাম্মদ ইউনুস তখন আমেরিকা থেকে বের করতেন *বাংলাদেশ নিউজ লেটার*। সেখানে তিনি মাঝে মাঝে কার্টুন এঁকেছেন। বিষয় বস্তুর ক্ষেত্রে তখন অন্যখানে প্রকাশিত অনেক কার্টুনেরই ছাপ আছে তাঁর কার্টুনে। সেটি স্বাভাবিক কারণ, তিনি তো মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আঁকতেন। শিল্পীতো আর নন।

১০

স্বাভাবিকভাবেই বিদেশি কার্টুনের সংখ্যা কম। ভারতে যে ভাবে মুক্তিযুদ্ধ অভিঘাতের সৃষ্টি করেছিল। পাশ্চাত্যে সেভাবে করার কথা নয়। পাশ্চাত্য থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় বিশ্ব রাজনীতির অনেক খবরের মধ্যে

বাংলাদেশ একটি খবর। তাছাড়া, পাশ্চাত্য ও যুক্তরাষ্ট্র প্রথম দিকে তো আর সেভাবে মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করেনি। তাছাড়া, বাংলাদেশ কোথাও তাও অনেকে জানতেন না। অবশ্য পাকিস্তান সম্পর্কে বিলক্ষণ ধারণা ছিল। সংবাদপত্রের হেডলাইন তাদের ভরসা। তাছাড়া, ভারতের প্রতিও তাদের তেমন জোর সমর্থন ছিল না। এ সবের প্রতিফলন পাই অনেকের কার্টুনে। বিশেষ করে ডিসেম্বরে যে সব কার্টুন পাচ্ছি সেগুলিতে বিষয়টি বোঝা যায়। কয়েকটি উদাহরণ দিই।

লস এঞ্জেলস টাইমসে কর্কি একটি কার্টুন এঁকেছেন। এক বিষাদগ্রস্ত দম্পতির কোলে একটি ভয়াল দর্শন অপুষ্টিতে ভরা শিশু। এ দম্পতি হলেন ইয়াহিয়া ও ইন্দিরা। তাদের যুদ্ধের ফল বাংলাদেশ যার ভবিষ্যত ঝরঝরে। ঐ একই পত্রিকায় গ্রান্টের একটি কার্টুন; গান্ধীর, যিনি অহিংসার প্রতীক। ভারত পাকিস্তানের ওপর আক্রমণ করছে তার জাতির পিতার নীতি উপেক্ষা করে। জেফ ম্যাকালনি দেখাচ্ছেন ভারত ও সোভিয়েত জোর করে বাংলাদেশ সৃষ্টি করছে। বিশ্ব পরিস্থিতি এমনিতেই সুবিধার নয়। তার ওপর ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ নতুন সমস্যার সৃষ্টি করছে।

Mauldin, Chicago Sun-Times
"You've all won the My Lai medal. with clusters."

সবাই তোমরা মাই লাই মেডেল পেয়েছ ক্লাস্টারসহ।
২৮ নভেম্বর ১৯৭১, দি লস এঞ্জেলস টাইমস/ মাউলাইন

শিকাগো সান টাইমসে আঁকা মাওলাইনের কার্টুন ব্যতিক্রম। তার ড্রয়িং এ পেইন্টিংসের আমেজ পাওয়া যায়। তার একটি কার্টুনে দেখা যায় ইয়াহিয়া তার সৈন্যদের গণহত্যার জন্য মাই লাই মেডেল দিচ্ছেন। ভিয়েতনামে অনেক গণহত্যার একটি মাই লাই গণহত্যা। মার্কিন লেফটেন্যান্ট কেলির নেতৃত্বে সেই গণহত্যা চালানো হয়েছিল। বিখ্যাত কার্টুনিস্ট ইয়াহিয়ার মুখ এঁকেছেন। তার পোষাকে স্বস্তিকা চিহ্ন। অর্থাৎ তিনি হিটলার।

ঐ সময়ে পাশ্চাত্যে প্রকাশিত কার্টুনগুলি যাঁরা এঁকেছেন তাঁরা হলেন জিবার্ড, হরনার, স্কার্ফ, গ্যারল্যান্ড, লুরি, ট্রগ, মাওলাইন, প্যাট আলিফ্যান্ট, পিসারসেন প্রমুখ। সেগুলি ছাপা হয়েছিল *গার্ডিয়ান*, *লস এঞ্জেলেস টাইমস*, *অবজারভার*, *টেলিগ্রাফ*, প্রভৃতি পত্রিকায়। এশিয় পত্রিকাগুলিতেও [ভারত ছাড়া] হয়ত কিছু কার্টুন ছাপা হয়েছিল সেগুলি সংগ্রহ করা যায় নি, *ফারইস্টার্ণ ইকোনমিক* উইকলি ছাড়া।

১১

প্রথমেই বলা হয়েছে, কার্টুন মূলত ঘটনার চাইতে একটা ন্যারেটিভ বা বয়ানকে বড়ো আকারে হাজির করে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সাধারণত চার ধরণের ন্যারেটিভ প্রচলিত আছে। আমাদের কাছে একাত্তর হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের বছর, গণহত্যার বছর ও স্বাধীনতা অর্জনের বছর। ভারত মুক্তিযুদ্ধকে দেখে মানবিকতার অবস্থান থেকে: শরণার্থীদের আশ্রয়দান, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ে দৌড়ঝাঁপ, এবং পরিশেষে সামরিক হস্তক্ষেপ। পাকিস্তানিদের কাছে একাত্তর 'অঙ্গচ্ছেদ' এর বছর, তারা মনে করেন ভারতের ষড়যন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে গিয়েছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম, বিশেষত মার্কিন গণমাধ্যম প্রথমত এটাকে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে 'সিভিল ওয়ার' হিসেবে দেখে, দ্বিতীয়ত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার যুদ্ধ হিসেবে দেখে। এই সংকলনে প্রকাশিত কার্টুনগুলোর অধিকাংশ যেহেতু ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত সেহেতু এখানে ভারতীয় ন্যারেটিভই ফুটে উঠেছে।

মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় ধরে ধরে এগোলে স্পষ্টত দেখা যাবে যে, ঘটনাবলীর সাথে সাথে কার্টুনের বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হচ্ছে। মার্চ-এপ্রিল মাসে অসহযোগ আন্দোলন, বাংলায় গণজোয়ার, ইয়াহিয়ার নির্মমতা, গণহত্যা, ভূট্টোর ষড়যন্ত্র, বিশ্ববিবেকের নিরবতাকেই বিষয়বস্তুর কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি, বিশেষত মার্কিন ও চীনা নীতির সমালোচনা করেও কার্টুন প্রকাশিত হয়েছে। মে-জুন মাসের দিকে কার্টুনিস্টরা ভারতীয় নীতির

সমালোচনা করা শুরু করেন, বিশেষত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার পক্ষে একধরণের সম্মতি আদায়ের চেষ্টা লক্ষ করা যায়। আবার, পাকিস্তানের আক্রমণে ভারতের কার্যত কোনো পদক্ষেপ না নেয়ার সমালোচনাও করা হয়। জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে শরণার্থী সমস্যা এবং বাংলাদেশ ইস্যু সমাধানে ভারতীয় কর্তাব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রচেষ্টার দিকে আলোকপাত করা হয়। অক্টোবর-নভেম্বর-ডিসেম্বরে প্রকাশিত কার্টুনগুলোতে আমেরিকা ও চীনা নীতির তীব্র সমালোচনার পাশাপাশি ইয়াহিয়ার আসন্ন পরাজয়ের দিকে বারেবারে ইঙ্গিত প্রদান করা হচ্ছিল। ডিসেম্বরে বিজয়কে কেন্দ্র করেও অনেকগুলো কার্টুন প্রকাশিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন পূজা-পার্বনে মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত করে বিভিন্ন কার্টুন আঁকা হয়।

১৪ মে ১৯৭১, *যুগান্তর*/অমল

কার্টুনগুলোর কিছু সাধারণ চরিত্র আছে। যেমন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্যারিকেচার দিয়ে বাংলাদেশের জনগণকে তুলে ধরা হয়েছে, ইন্দিরা গান্ধীকে দিয়ে ভারতীয় সরকারকে। এছাড়াও শরণ শিং এর ক্যারিকেচার বারেবারে এসেছে। পাকিস্তানকে ফুটিয়ে তুলতে ভূট্টো ও ইয়াহিয়া খানের ক্যারিকেচার ব্যবহার করা হয়েছে। অধিকাংশ সময় ইয়াহিয়া খানকে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর প্রাণীর সাথে তুলনা করা হয়েছে, এবং ভূট্টোকে মূলত ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। মার্কিন সরকারকে ফুটিয়ে

তুলতে নিক্সনের ক্যারিকেচার ব্যবহার করা হয়েছে, চীনা সরকারকে ফুটিয়ে তুলতে কখনো চৌ এন লাই, আবার কখনো মাও সে তুং এর মুখোচ্ছবিকে ব্যবহার করা হয়েছে।

১২

কার্টুন আনন্দ দেওয়ার পাশপাশি সমালোচনা করে। তবে রাজনৈতিক কার্টুনের সফলতা ও মত প্রকাশের তীব্রতা অনেকসময়েই নির্ভর করে একটা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ওপর। আবার সমসাময়িক কার্টুন পাঠ এবং প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আঁকা কার্টুন পাঠ- এর মধ্যে বহু ভিন্নতা দেখা দেয়। ১৯৭১ সালে আঁকা কার্টুনগুলো দেখলে, একদিকে সেই সময়কার পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা যেমন পাওয়া যায়, তেমনি সেই সময়কার ঘটনা কীভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত তৈরি করেছিল সে সম্পর্কেও একটা ধারণা পাওয়া যায়। আবার, কার্টুন এটা দেখাতেও সাহায্য করে যে, একাত্তরের ঘটনাসমূহকে কীভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছিল।

কার্টুনিস্ট চণ্ডী লাহিড়ী মন্তব্য করেছিলেন, "খুব কম কার্টুন জনমত গড়ে তোলে। কোনও ব্যাপারে জনমত গড়ে উঠলে, বা জনস্বার্থের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কার্টুন করলে, সে কার্টুন রাতারাতি খুব জনপ্রিয় হয়ে যায়।" অর্থাৎ যে বিষয়টি বা ঘটনা জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কার্টুন আঁকলে সেটা জনগণের মধ্যে সাড়া ফেলে। এদিক থেকে খেয়াল করলে একাত্তর সালে প্রকাশিত এই কার্টুনগুলো দিয়ে সেই সময়ের [বিশেষত কলকাতাবাসীর] জনমত ও জনমন দুটোকেই পাঠ করা সম্ভব বলে মনে হয়।

মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বের সিভিল সমাজের ভূমিকা ছিল অনন্য। সাধারণ মানুষ, অ্যাকটিভিস্টরা মিছিল করেছেন, সমাবেশ করেছেন বাংলাদেশের পক্ষে। লেখকরা, সংবাদকর্মীরা অনবরত তুলে ধরেছেন গণহত্যা, পাকিস্তানের নিষ্ঠুর আচরণ, শরণার্থীদের দুর্দশা। শিল্পীরা ছবি এঁকেছেন, সঙ্গীত শিল্পীরা গেয়েছেন অর্থ তুলেছেন শরণার্থীদের জন্য, কবিতা লিখেছেন কবিরা। আর কার্টুনিস্টরা এঁকেছেন অনবদ্য সব কার্টুন। গত ৫০ বছর এর কিছু কিছু আমরা দেখেছি মাত্র।

এ প্রবন্ধ লিখতে সহায়তা করেছেন ড. চৌধুরী শহীদ কাদের ও সহুল আহমদ।